নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—চার টাকা—

ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—অজিত গুপ্ত

মুদ্রণ—স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বন্ধুবরেষু

'দেখ, তুমি মানুষ হিসেবে খারাপ নও। তোমার হৃদয় বলে বস্তু আছে, লেখাপড়া শিখেছ, বুদ্ধি-বিবেচনাও কিছুটা আছে। কিন্তু তোমার যে একটি পরিবার—না, আমি শুধু তোমার স্ত্রীকেই 'মীন' করছিনে—তোমাদের বাড়ির সবায়ের কথাই বলছি—তোমার বাবা, মা, ছোট ভাই, মেয়ে-জামাই তাঁদের কাউকে বাদ দিচ্ছিনে—তাঁরা কেউ তোমার মনের কথা বোঝেনি। সবাই তোমার ওপর যাঁর যাঁর নিজের মত, নিজের জেদ জাহির করেছেন। আর তুমি তো তাঁদের হাতে একটি ব্যক্তিত্বহীন মাটির পুতুল। তার ফলে যা হবার হয়েছে। জল শুধু ঘোলা হয়নি, ঘোলাজলের ভিতর থেকে কাদাও উঠেছে। এখন আমি আর কী করতে পারি বল।'

বিমলেন্দু তার উকিল বন্ধু জয়দেব চাটুয্যের কটুতিক্ত সমালোচনা নিঃশব্দে হজম করতে লাগলেন। ঠিক হাসিমুখে নয়, ম্লান বিবর্ণ মুখে। সমবয়সী বন্ধুর ধমক তো নয়, যেন গুরুমশাই কি অফিসের ওপরওয়ালার ধমক।

জয়দেব একটু দম নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাই। সাড়ে নটা বাজল। চান-টান সারি গিয়ে। আজ আবার

প্রথম দিকেই গোটা দুই কেস আছে। তুমি যেও না, বসো। চা খেয়ে যাও।'

বিমলেন্দু মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'না-না, চা আজ থাক। কিন্তু ভাই, আমার ব্যক্তিত্বের ওপর তোমার প্রভাবও তো নিতান্ত কম নয়। সে কথাটা বাদ দিচ্ছ কেন?'

মাথা নিচু করে যেন নিজের মনেই কথাটা বললেন বিমলেন্দু। তারপর একটু হেসে মুখ তুলে তাকালেন। ভাবলেন বন্ধু কি জবাব দেয় শুনবেন। কিন্তু ব্যস্ত জয়দেব ততক্ষণে বৈঠকখানা ছেড়ে অন্দরের দিকে চলে গেছেন। দরজায় লাগানো নতুন গেরুয়া রঙের পর্দাটা নড়ছে একটু একটু। শূন্য দৃষ্টিতে বিমলেন্দু সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর চোখ ফিরিয়ে এনে ফের তাকালেন সামনের দিকে। বনাত-মোড়া টেবিলের পিছনে জয়দেবের গদি-আঁটা চেয়ারটি এখন শূন্য। কিন্তু ঘরটিকে শূন্য বলা যায় না। দুটো দেয়াল আলমারি-ভরা আইনের বই, টেবিলের চারিদিকে খানপাঁচেক দামী চেয়ার। এছাড়াও ঘরের উত্তর আর দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে বড় বড় দুখানা টুল পাতা রয়েছে। সাধারণ মক্কেলদের জন্যেই বোধ হয় এ ব্যবস্থা। দেয়ালে গান্ধীজী, জওহরলাল আর নেতাজীর ছবির সঙ্গে জয়দেবের বাবা জগদীশ চাটুয্যের একখানা বড় অয়েল পেইন্টিংও রয়েছে। দক্ষিণের দেয়ালে যে বড় ঘড়িটি টিক্ টিক করছে তার দামও নিতান্ত কম হবে না। বিমলেন্দুর

বন্ধু জয়দেব ওকালতিতে যে পশার জমিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। না, গাড়ি-বাড়ি এখনো করেননি, এখনো ট্রাম-বাসে কি বিশেষ তাড়া থাকলে ট্যাক্সিতেই কোর্টে যাতায়াত করেন জয়দেব। তবে বাড়ি করার জন্যে নিউ আলিপুরে পাঁচকাঠা জায়গা কিনেছেন, আর ব্যাঙ্কেও কিছু জমিয়েছেন। একথা জয়দেব নিজেই বলেছেন বিমলেন্দুকে। জয়দেব সুখী স্বচ্ছল আত্মবিশ্বাসে অটল পুরুষ। আর তারই সমবয়সী সহপাঠী বন্ধু হয়ে বিমল এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। সরকারি চাকরী পাননি। বে-সরকারী যে সব চাকরি জুটেছে সেগুলিও স্থায়ী হয়নি। চাকরি টিঁকিয়ে রাখতে হলে এবং তাঁকে ধাপে ধাপে উন্নতি করতে হলে যে সব গুণ যোগ্যতা চাতুর্য বুদ্ধিমত্তার দরকার তা বিমলেন্দুর মধ্যে নেই। এখন আছেন কলেজ স্কোয়ারে নন্দী ব্রাদার্স নামে এক পাবলিশিং ফার্মের সঙ্গে। ম্যানাসক্রিপট এডিট করা থেকে আরম্ভ করে প্রুফ-রীডিং এমন কি, সীজ্‌নের সময় কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে হাতে করে বই বিক্রি সবই করতে হয়। বিনিময়ে শ তিনেক টাকা পান। কিন্তু পরিবারে পোষ্যের সংখ্যা যথেষ্ট। জয়দেব যাঁদের নাম করেন—বুড়ো বাপ-মা, স্ত্রী, চারটি ছেলেমেয়ে আর ভাই অমলেন্দু সবাই বিমলেন্দুর ওপর নির্ভরশীল। না, অমলকে বিমলেন্দু নির্ভরশীল বলতে পারে না। বরং তার ওপরই বিমলেন্দুকে নির্ভর করতে হয়। মার্চেণ্ট অফিসের চাকরিতে সেও আজকাল প্রায় শ' তিনেক টাকা পায়। আর তার সব

টাকা দাদার সংসারের জন্যেই খরচ করে। অমল একান্নবর্তী হয়েও একা। বয়েস তারও চল্লিশ হতে চলল কিন্তু আজ পর্যন্ত বিয়ে-থা করেনি। অফিসের ইউনিয়ন, পাড়ার লাইব্রেরী, ক্লাব, স্কুল-কমিটি এইসব নিয়েই আছে। পাড়ার মধ্যে সে হাফ লিডার। বিমলেন্দু নিজের পাড়ায় তার নামেই পরিচিত, নিজের বাড়িতে তারই ছত্রচ্ছায়ে আশ্রিত। বিমল শুধু নামে বড়, নামে কর্তা। নিজের পরিবারে টিটুলার হেড।

আর স্বীয় রাজ্যে সত্যিকারের সম্রাট, স্বাবলম্বী, স্বপ্রতিষ্ঠ জয়দেব চাটুয্যে তাকে ধমকাবে বৈকি।

'বাবু চা নিন।'

চিন্তামগ্ন বিমলেন্দু চমকে উঠলেন। জয়দেবের চাকর ভজনদাস রবারের টি-রেষ্টের ওপর এক কাপ চা এনে রেখেছে। এতক্ষণে জয়দেবের বোধ হয় খেয়াল হয়েছে, পুরনো বন্ধু গরীব মক্কেল হয়ে এলেও তাকে একটু খাতির যত্ন করতে হয়।

বিমলেন্দু বললেন, 'আবার চা কেন।'

ব্যস্ত ভজন একথার কোন জবাব না দিয়ে ভিতরে চলে গেল। মুখে একটু বিরক্তির ছাপ। বোধ হয় এখনো তার রান্না সব নামেনি। এদিকে উকিলবাবু স্নান করবার জন্যে উঠে পড়েছেন। বিমলেন্দুর মনে পড়ল একটু আগে জয়দেব বলছিলেন বটে, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা বাড়িতে নেই। সব

ভবানীপুর গেছে। সেখানে জয়দেবের শ্বশুরবাড়ি। আজ তাঁর মেজ শ্যালকের ছেলের অন্নপ্রাশন। তাই আজ ঘরসংসারের ভার শুধু ভজনের ওপর। মনিবের তাড়া খেয়ে ভজনের বিরক্তি আসা স্বাভাবিক।

চায়ে দু-একবার চুমুক দেওয়ার পর বিমলেন্দু একটু চাঙ্গা বোধ করলেন। পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢোকাতেই কাঁচি মার্কা কাগজের প্যাকেটটির স্পর্শ পেলেন। একটি সিগারেট এখনো অবশিষ্ট আছে। নিজের মনকে ধন্যবাদ। দিয়াশলাইর বাক্সটি ফেলে আসেননি।

মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যান চলতে থাকলে বিমলেন্দু কিছুতেই সিগারেট ধরাতে পারেন না। অথচ অনেকেই পারে। জয়দেব তো পারেনই, কিন্তু বিমলেন্দুকে উঠে গিয়ে ফ্যানটা অফ করতে হল। তারপর তিনি সিগারেট ধরাতে পারলেন।

চায়ের সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া মিশবার পর বিমলেন্দু আর একটু সবল বোধ করলেন। দেহ তার কোনদিনই দুর্বল নয়। সাড়ে পাঁচ ফুটের নাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা। অসুখ-বিসুখে বিশেষ ভোগেননি, অনাচার অত্যাচার তেমন করেননি বলে শরীর এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও শেষ যৌবনকে ধরে রেখেছে। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে সুশ্রী বলে খ্যাতি ছিল বিমলেন্দুর। মাস্টার মশাইরা তার মুখ দেখে নম্বর দেন, দুষ্টু ছেলেদের কাছ থেকে এই অখ্যাতিও তার ফলে পেতে হয়েছিল। শরীরের সম্বন্ধে এখনো অভিযোগ করবার কোন কারণ ঘটেনি।

তাঁর দেহ বিশ্বস্ত অনুচরের মত তার সেবা করছে, প্রভুভক্ত অশ্বের মত তাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। যত অভিযোগ অনুযোগ বিমলেন্দুর নিজের মনের বিরুদ্ধে। জয়দেবের দোষ নেই। তিনি ঠিকই বলেছেন যে বিমলেন্দুর মন নিজের হাতের মুঠোয় নয়। তা অন্যের হাতে হাতে ঘোরে। তাদের হাতের চাপে তার চেহারার বদল হয়। আংটি তুমি কার? যার হাতে আছি? বিললেন্দুর মনও তার একার নয়। তা অনেকের প্রভাবে পুষ্ট, আবার অনেকের প্রভাবে দুষ্ট আর দুর্বল। অনেক সময় ভয় হয় বিমলেন্দুর। তিনি যেন সারা জীবন হিপন-টাইজড হয়ে চলাফেরা করছেন। সর্বদাই সম্মোহিত। কখনো এর মন্ত্রে কখনো ওর যন্ত্রে।

পা দুখানা টেবিলের তলায় আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে এবার বেশ একটু আয়েস করে বসলেন বিমলেন্দু। তারপর অভ্যাসমত নিজের জীবনের কথা, যে জীবন পারিবারিক বন্ধনে সীমাবদ্ধ, কখনো পীড়িত জর্জরিত, কখনো বা ছন্দের বাঁধনের মত ঝঙ্কৃত ধ্বনিত, সেই জীবনের কথা বিশ্লেষণ করতে বসলেন। এ এক চমৎকার occupation পেয়েছেন বিমলেন্দু। যখনই একা থাকেন তখনই নিজের জীবনের কথা নানাদিক থেকে নানা কোণ থেকে বিচার করতে বসেন। ছেলেবেলায় কোন কোন বন্ধুকে দেখেছেন তারা একা একা পেশনস্ খেলত। সেই ছিল তাদের আনন্দ। বিমলেন্দুর তেমনি আনন্দ আত্ম-বিশ্লেষণে। কিন্তু

আত্মজীবনের কথা ভাবতে গেলেই আত্মজনের কথা আসে, বন্ধু-জনের কথা আসে, নানা সম্পর্কের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, তার এগোন পিছোন, জোয়ার-ভাঁটা, মূর্চ্ছা-মৃত্যু, আবার হয়তো আকস্মিক অপ্রত্যাশিত অঙ্কুরোদগমের বিস্ময়—সবই এসে পড়ে। সমাজবদ্ধ পরিবারবদ্ধ বিমলেন্দু নিজেকে যতই নির্জন দ্বীপের অধিবাসী বলে মনে করুক সত্যিই তো সে আর একক নয়। জনসমুদ্রের অফুরন্ত তরঙ্গ তার সেই দ্বীপের ওপর অবিরাম ভেঙে পড়েছে। তাকে তিলে তিলে ভেঙে নিচ্ছে—তার সেই ব্যক্তি-সত্তাকে কে জানে তার অস্থিমজ্জায় নতুন দ্বীপ গড়ে উঠেছে কিনা।

বিমলেন্দু আত্মমনকে বিশ্লেষণ করতে ভালোবাসেন আর সেই সঙ্গে আত্মজনকে। যাদের তিনি এমন ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, যাদের উপর তিনি কখনো বিরক্ত, কখনো অনুরক্ত তাদের সম্বন্ধেও তিনি মাঝে মাঝে পরম বিস্ময়বোধ করেন। বিমলেন্দু যদি লেখক হতেন তাহলে লিখতেন এই বিস্ময়-রসের কথা। একেকটি সম্পর্কের আনুপূর্বিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। বিবরণ বললে কিছুই বলা হয় না। যে সম্পর্ক নানা বর্ণে গন্ধে স্বাদে বিচিত্র তা ঘটনা নয়, বিবরণ নয়, গল্প উপন্যাস ইতিহাস নয়, তার নাম জীবন। জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ তবু তার অন্য আখ্যা নেই। মহাসমুদ্রের জল আঁজলায় তোলা তবু তাতে সমুদ্রেরই স্বাদ।

বিমলেন্দু যদি লেখক হতেন লিখতেন সেই স্বাদ গন্ধের কথা। তিনি মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে চেষ্টা করেও দেখেছেন। হয় না, কিছু হয় না। মনের কথা কলমের মুখে এসে খেই হারিয়ে যায়। বালকের ভাষা বলে মনে হয় তখন। সে ভাষার কোন অর্থগৌরব নেই। অন্যচারিনী প্রণয়িনীর মত সে ভাষা বিমলেন্দুর মুখের ওপর উপহাস করে, বিমলেন্দুর চোখে সয় না।

বিমলেন্দু তাই মনে মনে লেখেন। কাগজ কলম মন লেখে তিনজন। কিন্তু বিমলেন্দুর এক মনই তিনের কাজ করে। তিনি একাই লেখক পাঠক সমালোচক। কোন কোন মুহূর্তে যে কোন লেখকই তাই। একনিষ্ঠ, একাগ্রভাবে সৃষ্টিরত মানুষের এই আত্মরতির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

জয়দেববাবু বিমলেন্দুকে ভালো বলে তার পরিবারের প্রত্যেকের নিন্দা করেছেন। শুধু আজ না—এমন আরো অনেকদিন বলেছেন জয়দেব। আর কেউ হলে বাদ-প্রতিবাদ করত; টেবিল চাপড়ে চীৎকার করত। কিন্তু বিমলেন্দু যেখানে সেখানে চীৎকার করে রাগ দেখাতে লজ্জা পান। আর তাঁর এই নিরীহতার জন্য আত্মীয়স্বজনরা লজ্জা বোধ করেন না। সবাই বলেন, অপমান হজম করবার শক্তি তাঁর বড় বেশি। কিন্তু তিনি নিজে জানেন—ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। আঘাতের বদলে যে তিনি অন্যকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, সেই আঘাতে তিনি নিজেই জর্জরিত হন। এই অজীর্নতা রোগ বড় সাংঘাতিক। ভিতরে ভিতরে তা আপন সত্তাকেই জীর্ণ করে।

বিমলেন্দুবাবুর ফের মনে পড়ল জয়দেব তার পরিবারের প্রত্যেককে নিন্দা করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁকেও বাদ দেননি। কারণ তিনি তো তাঁর পরিবার ছাড়া নন। তাঁর বাড়ির সবাইই যদি খারাপ হয় তাহলে তিনি আর ভালো থাকেন কি করে? তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ভালোত্বের কোন ছাপ তাঁর পরিবারের ওপর পড়েনি। অন্তত কয়েকটি মানুষকে যদি ভালোর দিকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে তিনি না পেরে থাকেন তাহলে তাঁর সততা নিষ্ফলা, বন্ধ্যা। তার কোন দাম নেই।

কিন্তু উকিল জয়দেববাবু যে তার পরিবারের প্রত্যেকের নিন্দা করেছেন সে শুধু একটি ঘটনা সম্বন্ধে। যে ঘটনায় বিমলেন্দু মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন, জয়দেবের সাহায্য নিয়েছেন বারবার হয়ত বন্ধুকে বিরক্ত করেছেন। জয়দেব বন্ধুর কাছ থেকে চক্ষুলজ্জায় টাকা নিতে পারেননি, আবার অত্যন্ত প্রফেসনাল হওয়ায় লোকসানের ক্ষতিও সহ্য করা তার পক্ষে হয়ত কষ্টকর হয়েছে। জয়দেববাবুর মত ক্ষতিগ্রস্ত একজন লোকই একটি বিশেষ ঘটনার আলোয় সবাইকে যাচাই করেছেন, বিচার করেছেন বিমলেন্দুর বাবা মা স্ত্রী আর ভাইকে, আর বড় জামাই দেবেশ আর মেয়ে জ্যোৎস্নাকে, তাঁর ছোট মেয়ে জয়ন্তীকে, যে এই বিশেষ ঘটনার মূল, যাকে কেন্দ্র করে গোটা পরিবারটা তিন বছর ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু উকিলের বিচারকে নির্বিচারে কি করে মানতে পারেন

বিমলেন্দু? হলেনই বা তিনি আবাল্যের বন্ধু। উকিল শত হলেও এক পক্ষভুক্ত—তিনি হয় ফরিয়াদীর না হয় আসামীর। নিরপেক্ষভাবে তিনি কি করে বিচার করবেন? তার চেয়ে বিমলেন্দুবাবু নিজেই বিচার করুন পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের, দোষত্রুটি-ভালোমন্দ খুঁটে খুঁটে দেখুন, শুধু একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়, তাঁদের সমগ্র জীবনের পটভূমিতে। এমন করে দেখতে বিমলেন্দু ছাড়া আর কেই বা পারবেন? একটি ঘটনার উৎপত্তির মূলে কত ঘটনার বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে, একটি ঘটনা কি দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর যে আরো কত ঘটনা ঘটতে থাকে, ঘটবার সম্ভাবনা থাকে তা বিমলেন্দু ছাড়া কে প্রত্যক্ষ করেছেন, কেই বা অনুভব করেছেন? পরিবারের প্রত্যেককে বিচার করতে গিয়ে বিমলেন্দুবাবু নিজেকেও অবশ্য রেহাই দেন না। প্রত্যেকের সম্পর্কে নিজেকেও তিনি বারবার যাচাই করবার, বিচার-বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পাবেন। এই আত্মবিশ্লেষণ তিনি প্রায়ই করেন। জয়দেব জানেন না যে বিমলেন্দু নিজের সম্বন্ধে কত নির্মম নিরপেক্ষ আর নিষ্ঠুর। নিজের ওপর নিষ্ঠুর বলেই অন্যের ওপর তাঁর অনুকম্পা এত বেশি। নিজের দুর্বলতার কথা জানেন বলেই অন্যের দুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, সহ্য করতে পারেন। তাঁর এই সহনশীলতাকেই আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব বলে ভাবেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেও অবশ্য নিঃসন্দেহ নন।

পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক আর প্রবীণ বিমলেন্দু-বাবুর বাবা কুলদাকান্ত সোম। সেই বাবাকেই কি প্রথম বিচার করতে শুরু করবেন বিমলেন্দু? পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধকে বিচার করবেন পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়? ছেলে হয়ে বাবাকে বিচার করবেন? ছি ছি ছি, বিচার নয়, বিচার করবার তাঁর কোন অধিকার নেই। বিচার শুধু মানুষ নিজেকেই করতে পারে। বিচার করা যাঁদের পেশা, যাঁরা মুনসেফ, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, কি যাঁরা গুরু-পুরোহিত, ধর্মযাজক, সংস্কারক, সমালোচক তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা পরের বিচার করেন, নিজেদের অপরাধের ঝুলিটি বগলদাবা করে রেখে তাঁরা অপরের পুঁটলি কেড়ে নিয়ে খুলে দেখেন তার মধ্যে কি আছে না আছে। এই পরচর্চায় হৃদয়-চর্চার স্থান কদাচিৎ থাকে। কিন্তু বিচার করা যাঁদের নেশা, আত্মবিচার ছাড়া অন্য কোন কাজে তাঁদের মন ওঠে না। নিজের গণ্ডীর বাইরে তাঁরা পা বাড়ান না।

নিজের বাবাকে বিচার করতে পারেন না বিমলেন্দু। কিন্তু তাঁর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাঁর মনে হয় তিনি যেমন তাঁর বাবাকে বুঝেছেন তাঁর বাবা নিজেকে কিংবা বিমলেন্দুকে এমন করে বুঝতে চেষ্টা করেননি। সকলেরই তো এই ধরণের প্রবণতা নেই। দেখাশোনা কথাবার্তা একসঙ্গে বাস করার ভিতর দিয়ে একজনের সম্বন্ধে আরেক জনের জ্ঞান যতখানি স্বাভাবিকভাবে আসে তাতেই সংসারে শতকরা নিরানব্বুই জনের কাজ চলে যায়। যে দুএকজনের চলে না তাঁরা যে বেশী ভাগ্য-

বান তা নন বরং তাঁরাই বেশি দুর্ভাগা। বিমলেন্দুবাবুর মনে হয় তাঁরাই দুনিয়ায় কষ্ট পান বেশি। তাঁরা আরো বেশি জানতে চান, আরো বেশি বুঝতে চান, আরো বেশি দিতে চান, পেতে চান। কিন্তু দেওয়া-নেওয়ার ধরণে কোথায় যেন একটা গোলমাল থেকে যায়। তাঁদের মন নড়ে তো দেহ নড়ে না। তাঁরা মূর্তিমান একেকটি অকর্মক ক্রিয়া দারুভূত মুরারি। কিন্তু সেই দারুর ভিতরে দাবাগ্নি জ্বলে।

বিমলেন্দুবাবুর বাবা কুলদাকান্তের অত জানবার কথা নয়, অত জ্বলবার কথাও নয়। তিনি ছিলেন তাঁদের ছোট মহকুমা শহরের হাইস্কুলের মাস্টার। হেডমাস্টার কি এসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাস্টার নন, নিচের ধাপের টিচার। থার্ড ক্লাসের ওপরে পাড়বার অধিকার ছিল না তাঁর। বিমলেন্দু বড় হয়ে জানতে পেরেছিলেন তাঁর বাবা যেটুকু লেখাপড়া জানেন ভাল করেই জানেন। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণ ভালো, ইংরেজী শেখাবার পদ্ধতি ভাল, তিনি অঙ্ক জানেন না, কিন্তু বাংলা ইতিহাস আর ভূগোল ভালই জানেন তবু আণ্ডার-গ্রাজুয়েট বলে তাঁকে উঁচু দুই ক্লাসে পড়াতে দেওয়া হত না। এই নিয়ে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তিনি বলতেন, 'মধুবাবু আর যতীনবাবুর শুধু বি-এ ডিগ্রীটাই আছে, কিন্তু ওই সার্টিফিকেট ছাড়া ভিতরে আর কিচ্ছু নেই।'

শান্ত আর নম্র-স্বভাবের জন্য মধুবাবু আর যতীনবাবু কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে, টিচারদের মধ্যে প্রিয় ছিলেন। শহরের অন্য পাড়ার লোকেরাও তাঁদের ভালো বলতেন। বিমলেন্দুবাবুর

মনে পড়ে বাবার মুখে ওই দুজন মাস্টারমশায়ের নিন্দা তাঁর ভালো লাগেনি। অথচ আর কারো মুখে তাঁর বাবার নিন্দাও তাঁর কাছে অসহ্য লাগত; এখনো যেমন লাগে। লোকে বলত তাঁর বাবা বড় অহঙ্কারী, পরশ্রীকাতর, ছিদ্রান্বেষী, আর সব চেয়ে যেটা তাঁর মহদ্দোষ, সে হল ছাত্রদের ওপর তাঁর দুর্ব্যবহার। বিমলেন্দু নিজেই তা দেখেছেন। তাঁদের সেকশনেও তাঁর বাবা ক্লাস নিতে আসতেন। যে ছেলে উচ্চারণে ভুল করত তাকে তিনি ভেংচি কাটতেন, তার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ করতেন, যে পড়া পারত না তাকে তিনি ক্লাসে সবায়ের সামনে বিদ্রূপ করতেন, বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতেন, যেসব ছেলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, কি বইয়ের ছেঁড়াপাতা কি টুকরো কাগজ দেখে নকল করত, তাদের ধরে তিনি হেড-মাস্টারের ঘরে নিয়ে যেতেন, কাউকে বিন্দুমাত্র রেয়াৎ করতেন না, প্রেসিডেণ্ট-সেক্রেটারীর ছেলে হলেও না। এনুয়াল পরীক্ষা হলে এসব ছেলের প্রোমোশন বন্ধ হয়ে যেত, টার্মিনাল পরীক্ষা হলে জরিমানা হত, বেত পড়ত পিঠে, আর হাতের তেলোয় বেত মারবার ভার হেডমাস্টার মশাই বেছে বেছে বিমলেন্দুর বাবাকেই দিতেন। এ কাজে কুলদাবাবুর বেশ একটা আনন্দ ছিল। তাঁর বেতের দাগ ছেলেদের পিঠ থেকে সহজে মিলাতে চাইত না, মনের মধ্যেও দীর্ঘকাল তারা তা পুষে রাখত। বিমলেন্দুর বাবাকে সবাই ভয় করত কিন্তু শ্রদ্ধা করত না, ভালোবাসত না। অথচ কুলদাবাবুর অনেক গুণ ছিল। তিনি

গান গাইতে জানতেন, অভিনয় করতে জানতেন। তাঁর রাম, যুধিষ্ঠির আর আলিবর্দি দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিত।

কিন্তু তাঁর সেই অভিনয়-দক্ষতা তাঁকে ছাত্রদের আক্রোশ থেকে বাঁচাতে পারল না। একদিন খেয়াঘাটের কাছে তিনি প্রচণ্ড মার খেলেন। মারের চোটে তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হল, দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল, অমন সুন্দর মুখখানি বেঁকে রইল। বাবার সে মুখের দিকে বিমলেন্দু বহুদিন তাকাতে পারেননি। মার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছেন। তখন তিনি বেশ বড় হয়েছেন। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন। তাঁর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। আত্মীয়স্বজনরা মামলা-মোকদ্দমার কথা তুললেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অতদূর গড়াল না। হেডমাস্টার মশাই কয়েকটি ছেলেকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই ছিল। থানার দারোগা তাদের ডেকে নিয়ে ধমকে দিলেন। ব্যাস ওই পর্যন্ত। কুলদাবাবু কিছুদিন ছুটিতে রইলেন। তারপর আবার ওই স্কুলেই মাস্টারি করতে শুরু করলেন। তিনি যে পুরোপুরি বদলালেন তা নয়। তবে অনেক হিসেবী হলেন, অনেক সতর্ক হলেন। আস্তে আস্তে অনেকেই ব্যাপারটা ভুলে গেল। কিন্তু বিমলেন্দু ভুলতে পারলেন না। এই ঘটনাটা তাঁর আর তাঁর বাবার সম্পর্ককে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। বাবা শেখাতেন, 'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।' বিমলেন্দু ভাবতেন যে, কোন পিতা, যে

পিতা শুধু পুত্রকন্যা-বৎসল, না আদর্শ মানুষও? বিমলেন্দু দ্বিধায় পড়তেন। তাঁরা চারটি ভাইবোন ছিলেন। বাবা তাদের আদর-যত্ন করতে, খাওয়াতে-পরাতে কোন ক্রটি করতেন না। নিজের সংসারকে তিনি ভালোবাসতেন। কিন্তু লোকের কাছে তিনি যে ভালো লোক নন, বিমলেন্দুর প্রিয় মাস্টার মশাইদের মত জনপ্রিয় আর শ্রদ্ধেয় নন, সেই ব্যথা, সেই দুঃখ বিমলেন্দু ভুলতে পারতেন না। তিনি তাঁর বাবার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতেন; তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেন না, ডাকলেও তেমন করে কাছে যেতেন না, যেমন তাঁর ছোট ভাই অমল যেত। কুলদাবাবু বিমলেন্দুর আড়ালে বলতেন, 'ওকে আমি দেখতে পারিনে, ও বাঘের ঘরে ঘোগের ছানা হয়ে জন্মেছে।' অন্য মাস্টার মশাইরা কথাটা অন্যরকম করে বলতেন, তাঁরা বলতেন, 'জহ্লাদের ঘরে প্রহ্লাদ।'

বিমলেন্দুর বাবা তাঁর ছোট ছেলেকে নিজের মত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। নিজের মন আর মেজাজ যেন অমলেন্দুর মধ্যে ভরে দিলেন তিনি। তাকে সঙ্গে নিয়ে হাটে বাজারে যান, আত্মীয়বন্ধুর বাড়িতে যান, তার সঙ্গে সংসারের নানা বিষয়ের পরামর্শ করেন। অমলের ওপর যে তাঁর পক্ষপাত বেশি তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তা দেখে বিমলেন্দুর মা মন্দাকিনী বললেন, 'তোমার এই ধরণ-ধারণ তো ভালো নয়। তোমার দুই ছেলে, একজন আর একজনকে হিংসে করুক, একজন আর একজনের সঙ্গে লাঠালাঠি করুক—তাই কি তুমি চাও? না কি

একজন একজনের হাতের লাঠি হোক সেই ভালো ?'

কুলদাবাবু বললেন, 'অতশত বুঝিনে। দুটির মধ্যে যেটি বৈষ্ণব সেটি তোমার, যেটি শক্তি সেটি আমার। আমি শক্তির উপাসক।'

মন্দাকিনী কিন্তু বৈষ্ণব-শাক্তের মিলনই চাইতেন। পিতা-পুত্রের, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মধ্যে যাতে মনের মিল বাড়ে সেইদিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

বিমলেন্দুকে ডেকে বলতেন, 'কিছু মনে করিসনে বাবা। উনি মুখে ওসব কথা বললেও মনে মনে তোকে ভালোই বাসেন। মানুষকে শুধু বাইরে থেকেই বিচার করিসনে, তার ভিতরটাও দেখিস।'

মার দেওয়া এই মন্ত্রই বিমলেন্দুর জীবনের বীজমন্ত্র। মানুষকে তার ভিতর থেকে দেখতে হবে। বাপ-মার আদেশ আর অনুরোধ সত্ত্বেও কুলগুরুর কাছে কিছুতেই দীক্ষা নেননি বিমলেন্দু। তিনি দেবতা মানেন না, শুধু পাকা বামুন হলেই তাকে বামুন বলে স্বীকার করেন না, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর, পরকাল কোন কিছুতেই আজ আর তাঁর বিশ্বাস নেই। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে তিনি চট করে রায় দেন না। কাউকে এক কথায় ঝট্ করে লম্পট দুর্বৃত্ত বলে চিহ্নিত করতে তাঁর মন সরে না। তিনি যাঁদের সংস্পর্শে আসেন তাদের প্রত্যেককে ভিতর থেকে দেখতে চান। কিন্তু সবাইকে কি তা পারেন ? সব সময় কি

তা পারেন? তাঁর শক্তিরও তো সীমা আছে। সেই শক্তি এতই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, তা এতই দুর্বল আর অনুপযুক্ত যে বিমলেন্দুর মনে হয় যে অন্য একজন তো দূরের কথা, নিজের মধ্যেও তিনি গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারেননি। অন্যকে শোধরাতে গিয়ে তাঁর মনে হয় নিজেই তিনি বিশুদ্ধ নন।

কলেজ জীবনে প্রথম যৌবনে বাবার কাছ থেকে তিনি দূরে রইলেন। বাবা রইলেন গোকুলপুরে মাস্টারি নিয়ে। বিমলেন্দু চলে এলেন কলকাতায়। মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের বিদায় দৃশ্য। তাঁকে দূরে পাঠাতে গিয়ে শুধু মার নয়, বাবার চোখও ছলছল করে উঠেছিল। মেসে-হোটেলে থেকে, টুইশন করে পড়াশুনো চালিয়েছেন বিমলেন্দু। তাঁর উচ্চ শিক্ষার পুরোপুরি খরচ বাবা বহন করতে পারতেন না। গরীব স্কুল মাস্টার। আরো ছেলেমেয়ের দায়িত্ব ছিল। বিমলেন্দুর বাবা মাঝে মাঝে বড় বড় চিঠি লিখতেন। তাঁর সেই চিঠিতে প্রথম প্রথম শুধু পড়াশুনো আর অনাড়ম্বর চালচলন সম্বন্ধে বড়ো বড়ো উপদেশ থাকত। তারপর আস্তে আস্তে উপদেশের ভাগ কমে আসতে লাগল। সংসারের নানারকমের অভাব-অভিযোগ, নানা লোকের সম্বন্ধে নালিশ, ঈর্ষা, ক্ষোভ, দ্বেষ-বিদ্বেষ, সেই সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা, উদ্বেগ, অশান্তি, ছেলের সম্বন্ধে সাধ-আহ্লাদের কথাই তিনি জানাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বাবার সঙ্গে বিমলেন্দুর সম্পর্ক বদলাতে লাগল। বাবা হয়ে উঠলেন বন্ধুর মত। যদিও

তাঁর সব কাজ, সব আচরণ বিমলেন্দু পছন্দ করতেন না, স্কুলের মধ্যে তাঁর ক্লিক, স্কুল-কমিটির একান্ত অনুগত থাকার দরকার হলে প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিকে হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে লাগাবার চেষ্টা, আবার সুযোগ বুঝে হেডমাস্টারের পক্ষ নেওয়া, তাঁর এসব কাজে বিমলেন্দু সমর্থন করতে পারতেন না, এসব কাজের পরিণাম যে খারাপ হতে পারে তাও তিনি মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে জানাতেন। খুব স্পষ্ট করে মারের কথাটা মনে করিয়ে দিতে বিমলেন্দুর লজ্জা করত। কিন্তু বাবার অনেক কাজ অনেক চালচলন পছন্দ না করলেও তাঁকে তিনি দুঃখ দিতে পারতেন না। সমালোচনা করতেন কিন্তু অপমান কি অসম্মান করতে পারতেন না। বিমলেন্দুর মনে হয় জয়দেব ওই স্কুলের ছাত্র ছিল বলে সে তার বাবাকে শুধু কড়া মাস্টার হিসেবে জানে, ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত, সহকর্মীদের নিন্দিত কূটপ্রকৃতির মানুষ হিসেবে জানে। কিন্তু জয়দেব তো বিমলেন্দুর বাবাকে জনক হিসেবে কোনদিন দেখেনি। বাবার এখনকার চেহারাও জয়দেবের অজ্ঞাত। তাঁর দাঁতগুলি সব পড়ে গেছে, মাথার বারআনি জুড়ে টাক। বাকি যে চুলগুলি আছে তাও সব পেকে গেছে। চোখে ভালো করে দেখতে পান না। আজ তিনি একান্তভাবেই দুই ছেলের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর সেই স্কুল নেই, ছাত্রশাসন নেই, কূটনীতির ক্ষেত্র নেই। পরিবার থেকেও তাঁর কর্তৃত্ব গেছে। কোনরকমে ঘরের বাইরে এসে রোয়াক-খানির ওপর তিনি বসে থাকেন। শহরগুলির রাস্তা দিয়ে

যাত্রীভরা বাস যায়, লোকজন চলাচল করে, তিনি সেইদিকে তাকিয়ে থাকেন। ছেলেকে ডেকে বলেন, 'ভালো দেখতে পাইনে খোকা, ভারি আবছা আবছা লাগে। আমার চশমাটা পালটে দে।' কিন্তু পালটালে কি হবে। ডাক্তার বলেছেন ওচোখ আর ভালো হবে না। ক্যাটারকট অপরেশন করার পর প্রায় অন্ধ হবার সামিল হয়েছিলেন। এখন একটু একটু দেখতে পান। বিমলেন্দু জানেন ওই আবছা দেখতে দেখতেই তাঁকে একদিন চোখ বুজতে হবে। সেদিন আর কিছুই চোখে পড়বে না। সব আগ্রহ, সব কৌতূহল, সব তৃষ্ণার শেষ হবে। বিমলেন্দুর বন্ধু জয়দেব তার বাবার এই রূপ দেখেনি। এই পরিণামের কথা ভাবেনি। তাহলে রূঢ় কথা বলতে গিয়ে তার মন একটু নরম হত।

বিমলেন্দু বলতে চান না বৃদ্ধ হলেই মানুষের সব দোষ কাটে। তার সাত-খুন মাপ হয়ে যায়। তা হয় না। বৃদ্ধেরও ক্ষুধা থাকে, তৃষ্ণা থাকে, ক্রোধটা অতি মাত্রায় বাড়ে, হিংসা, দ্বেষ, মান অভিমান কিছুই তাঁকে ত্যাগ করে না। করে যে না তা এই জয়ন্তীর ব্যাপারেও বিমলেন্দু লক্ষ্য করেছেন। বাবার অনেক কথায় অনেক ব্যবহারে তিনি উত্যক্ত হয়েছেন। কিন্তু যখনই তাঁর ওই জরাজীর্ণ অসহায় অবস্থা দেখতে পেয়েছেন, নিষ্ঠুর হতে গিয়ে রূঢ় হতে গিয়ে থমকে গেছেন বিমলেন্দু। অনেক সময় কটুকথা বলে ফের গিয়ে বাবার গা ঘেঁষে বসে-

ছেন। তাঁর পিঠের লোল চর্মে হাত রেখে বলেছেন, 'বাবা, আপনি কি আজকাল আর পিঠে তেল মাখেন না?'

বৃদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন মানুষ মহাপুরুষ হয় না, কেন নিজের রূপান্তরিত দেহের দিকে তাকিয়ে তাঁর আত্মজ্ঞান হয় না, কেন ষড়রিপু কোন না কোন ভাবে মানুষের ওই বিকৃত রূপকে আশ্রয় করে তাকে আরও বিকৃততর করে তোলে, সেকথা মাঝে মাঝে ভাবেন বিমলেন্দু। ভেবে দুঃখ পান, অসহায় বোধ করেন। ভাবেন তিনি বৃদ্ধ হলেও কি তাঁর বাবার মতই হবেন? ঠিক ওই রকম খিটখিটে, বদমেজাজী, দেহসর্বস্ব, আর সেই সঙ্গে অবহেলিত, অবজ্ঞাত, উপহাস্য, আর সব থাকতেও একান্ত অসহায়?

বিমলেন্দুর মা অবশ্য অতটা বুড়ো হননি। বাবার চেয়ে তিনি বছর দশেকের ছোট। তাঁর চুল পাকলেও অত বেশি পাকেনি, ঘোমটায় ঢাকা থাকে বলে তেমন দেখাও যায় না। কালো রঙ, বেঁটে খাটো চেহারা, বয়সের তুলনায় এখনও বেশ শক্ত গড়ন। দাঁত মাত্র কয়েকটা পড়েছে। সেগুলি সামনের দিকে নয় বলে তত টের পাওয়া যায় না। শরীরটা শক্ত আছে বলে এই বয়সেও মা খাটতে পারেন। আর খাটতে পারেন বলেই সহজে নিজের অধিকার ছাড়তে চান না। বিমলেন্দুর স্ত্রী তাঁকে জোর করে সংসার থেকে অবসর নিতে বলে, কিছু ভক্তি-শ্রদ্ধার পেনসন দিতে চাইলে কি হবে বিমলেন্দুর মা তা নেবেন না। তিনি সংসারের সব ব্যাপারে আসবেন, সব কথায় থাকবেন, সব

সমস্যায় মাথা গলাবেন, মুখ বাড়াবেন। আর তাই নিয়েই তো বিমলেন্দুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর লাগে। এতখানি বয়স হল, এতকাল ধরে একসঙ্গে আছেন, তবু পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া মিটল না।

এখনো খুঁটিনাটি নিয়ে ছেলের বউয়ের সঙ্গে তাঁর মহা-বিরোধ লেগে যায়। স্বামী বেঁচে থাকতে, ছেলে বেঁচে থাকতে, অন্যের কাছে তাঁকে এভাবে অপমানিত হতে হয় তা তাঁর সয় না। তা নিয়ে পাড়াপড়শীর কাছে পর্যন্ত তিনি আপসোস করেন। বিমলেন্দুর বাবাও ক্ষুব্ধ বা কম উত্তেজিত হন না। তিনি বলেন, 'তুমি এলে কেন? আমি তো তখনই বলেছিলাম, তুমি এদের মধ্যে থেকে শান্তি পাবে না। এরা খাওয়াবে তপ্ত হাগাবে রক্ত। ছুটো ভাতের বদলে এরা হাতে ধরে শুধু মারতে বাকি রাখবে। আমি তখনই বলেছিলাম, এখানে মানসম্মান নিয়ে বাস করতে পারবে না।'

যেন বিমলেন্দুর বাবা-মা সত্যিই তাঁর বাবা নন—যেন আলাদা এক শরিক। এই সব মুহূর্তে তাঁর বাবা স্ত্রীকে শুধু স্ত্রী বলেই ভাবেন। তাঁর স্ত্রী যে বিমলেন্দুর মা, তাঁর ছুই মেয়ে জ্যোৎস্না আর জয়ন্তীর আদরের ঠাকুরমা, একথা তিনিও ভুলে যান।

বিমলেন্দুর মা মন্দাকিনীও সেকথা মনে রাখেন না। তখন একান্তভাবে বিমলেন্দুর বাবার সহধর্মিণী। এছাড়া তাঁর যেন আর কোন দ্বিতীয় সত্তা নেই। বিমলেন্দু লক্ষ্য করেছেন

অমনিতে তাঁর বাবা-মার মধ্যে খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হয়, এই দুই বুড়োবুড়ি যেন খোকাখুকির মত ঝগড়া করেন, মান-অভিমান করেন, কথায় কথায় পরস্পরকে গালাগাল দেন। বিমলেন্দু ভেবে অবাক হন এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা কী করে এক সঙ্গে আছেন। কী করে তাঁরা পরস্পরকে সহ্য করছেন। কিন্তু যখন বিমলেন্দু কি তাঁর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে ওঁদের কারো মতান্তর-কথান্তর হয়, অমনি ওঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক ঘনতর হয়ে ওঠে। একজন আর একজনের অন্যায়কে সমর্থন করেন, অযৌক্তিক কথাবার্তা আচার-আচরণকে সমর্থন করেন। বিমলেন্দুর মা ভুলে যান তাঁর স্বামী চিরকাল ভালোমানুষ ছিলেন না। এখনো পুরোপুরি ভালোমানুষ নেই। যযাতির মত বিমলেন্দুর বাবা যদি ফের তাঁর যৌবন ফিরে পান, ফের সেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছতে পারেন, তাহলে বিমলেন্দুর খুবই বিশ্বাস, তিনি ঠিক আগের মতই ব্যবহার করবেন। ছাত্রদের নিষ্ঠুরভাবে শাসন চলবে, স্কুল-কমিটির মেম্বারদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি, সহকর্মী শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি—যেসব কাজে কুলদারঞ্জনের উৎসাহ এবং দক্ষতা ছিল, সেগুলির সবই তিনি শুরু করবেন। মাঝে মাঝে বিমলেন্দুর মনে হয় যে মানুষ মূলতঃ বদ হতে চায় না। সে কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি। তার চিন্তা চেষ্টা সবই সেই অভ্যাসগুলির অনুবৃত্তি, পূর্বানুবৃত্তি। পুরনো অভ্যাস বদলানো কি নতুন কোন সদভ্যাস আয়ত্ত করা সহজ নয়। শুধু বয়স মানুষকে তা দেয় না, শুধু অভিজ্ঞতা তা দেয় না। সচেতন

চেষ্টায় যত্নে এক-একটি সদ্‌গুণকে মানুষের আয়ত্ত করতে হয়। নিত্য অনুশীলন করে সেই অর্পিত গুণকে তার ধরে রাখতে হয়। শুধু বয়স হলেই বিচার-বিবেচনা ধীরতা শুভবুদ্ধি কোন মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে না। প্রাচীন বটগাছের মত বহুলোকই তাদের অজ্ঞাতে বুড়ো হয়। তাদের চুল পাকে, দাঁত পড়ে, গায়ের চামড়া ঢিলে হয়। কলের দংশনক্ষত তাদের সর্বাঙ্গ চিহ্নিত করে। কিন্তু আর কিছু বাড়ে না। কারণ বয়সটা বিনা চেষ্টায় বাড়ে, আর সব কিছুই মানুষকে কষ্ট করে বাড়াতে হয়। তাই বয়োবৃদ্ধ শুধু বয়সের সম্পদ নিয়ে সমাজে শ্রদ্ধা-ভাজন হন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যদি জ্ঞানবৃদ্ধ না হতে পারেন, হৃদয়ধনে সমৃদ্ধ হতে না পারেন, স্নেহ-ক্ষমা-সহনশীলতায় যদি বয়ঃকনিষ্ঠদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে তাঁর মাথা না তুলতে পারেন, তাহলে তিনি শুধু আত্মীয়স্বজনের অনুকম্পাভাজন হয়ে থাকেন, তাঁর বেশি কিছু হন না বা পান না, এমন কি যাঁরা তাঁর আত্মজ সেই পুত্র-পৌত্রদের কাছ থেকেও না। নিজের বাবা-মার সমালোচনায় এই কথাই মনে হয় বিমলেন্দুর। তাঁর ঘরে গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবা-মার যুগল ফটোও টাঙ্গিয়ে রেখেছেন তিনি। অনেককে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা ঘর থেকে বেরোবার সময় ইষ্টদেবতার সঙ্গে বাপ-মার প্রতিকৃতির কাছে জোড় হাত কপালে ছুঁয়ে প্রণাম করেন; কেউবা সেই ফোটোতে হাত দিয়ে প্রতিকৃতির পায়ের ধূলো নেন। ওই ধরণের ভক্তি বিমলেন্দুর নেই। তিনি মাঝে মাঝে শুধু বাবা-মার প্রৌঢ়বয়সের প্রতিকৃতির

দিকে চেয়ে দেখেন। মানে যখন মনে পড়ে যায়, দেখবার কথা হঠাৎ মনে হয়, তখনই দেখেন। বাবার পাশে মায়ের জড়সড় চেহারা, যাতে ফোটোটা ভালো ওঠে সেজন্মে বাবার সচেতন ভাব লক্ষ্য করে কখনও কখনও একটু হাসি পায় বিমলেন্দুর। জীবন্ত বাবা একটু দূরে কোণের ছোট ঘরে বার্ধক্যের দাম্পত্য জীবন-যাপন করেন। হয়ত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন, কি পুত্র-পুত্রবধূর নাতনীদের চালচলন আচার ব্যবহার নিয়ে দুঃখ করেন, আপসোস করেন, আর বিমলেন্দু তাঁর এই দুই পরম অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন, চেয়ে চেয়ে দেখেন তাঁর মায়া মমতা শ্রদ্ধা ভালোবাসার দুই পরম রসবিগ্রহকে, কিন্তু তাঁর এই প্রৌঢবয়সে সেই রসের ধারা এখন শুষ্কপ্রায়। বিমলেন্দুর মনে হয় বাবা-মার সম্বন্ধে সেই রসসিক্ত মনোভাব তাঁর আর এখন নেই। ওঁদের অসুখ-বিসুখের সময় কি অন্য কোন মানসিক কষ্টের মুহূর্তে সেই রসার্দ্র মাহেন্দ্রক্ষণ কখনো কখনো বিমলেন্দুর মনে ফিরে আসে। তিনি তাঁর বাবার গা ঘেঁষে বসেন, কি বৃদ্ধা মাকে হঠাৎ গিয়ে জড়িয়ে ধরেন। হয়তো মা তার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে ভাবেন ছেলেটা কি সংসারের চিন্তাভাবনায় পাগল হয়ে গেল—নাকি বুড়ো বয়সে কুসঙ্গে পড়ে হঠাৎ মদ-টদ খেতে শিখল?

কিন্তু এই ধরণের আবেগঘন মুহূর্ত আজকাল কদাচিৎ আসে। বাবা-মা বেঁচে থাকলেও, একই বাড়িতে পাশের ঘরে থাকলেও, তাঁদের বার্ধক্য-জীর্ণ শরীর দিনের মধ্যে বহুবার

চোখে পড়া সত্ত্বেও, তাঁদের স্খলিতকণ্ঠ বারবার কানে যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের অস্তিত্ব সব সময় অনুভব করেন না বিমলেন্দু। লোকে যেমন অন্যমনস্কভাবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘড়ির ছুটো কাঁটা দেখতে পায় না, কটা বেজে ক'মিনিট হল কিছুতেই তা বলতে পারে না, তেমনি বিমলেন্দুর বাবা-মাও তাঁর কাছে এখন ছায়া কি আবছায়ার চেয়ে বেশি কিছু নন। ইহলোকে থেকেও তাঁরা বিমলেন্দুর জাগ্রত চিত্তলোক হতে সক্রিয় জীবনক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত অপসারিত। সংসারের নিয়মই বোধ হয় এই। তা কেবলি মরে, কেবলি মরে। কিছুই ধরে রাখে না। যাকে রাখে তাকেও বারবার রূপান্তরিত ক্ষেত্রান্তরিত পাত্রান্তরিত করে। এ সংসারে এই জীবনই যে শুধু অনিত্য তাই নয়, শুধু যে কালান্তরেই তার অস্থায়িত্ব প্রকাশ পায় তাই নয়, সংসারের সব কটি সম্পর্ক এমনি ক্ষণভঙ্গুর, অস্থায়ী আর নিত্য পরিবর্তনশীল।

অথচ মার সঙ্গে কি গভীর রসঘন আবেগের সম্পর্কই না বিমলেন্দুর ছিল। বাবার চেয়ে মাকে তিনি ভালোবাসতেন বেশি। ছেলেবেলায় সব ছেলেমেয়েই বোধ হয় তাই বাসে। শুধু যে ভ্রূণের আকারে সে মার অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে তাই নয়, ভূমিষ্ঠ হবার বহুকাল পরেও মার দেহের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। সেই শৈশব আর বাল্য কৈশোরের স্মৃতি আর সংস্কার কি অত সহজে নষ্ট হবার? তা কি সারা জীবনই থেকে যায় না? তাই বুঝি মানুষ কোনদিন পুরোপুরি পরিণত মানুষ

হয় না, তার অতীতের ছেলেবেলা তাকে থেকে থেকে পিছনে টানে। পরিণত হয়ে মানুষ যখন গম্ভীরভাবে তার পাকা দাড়িতে হাত বুলোয় আর পাকা চুলের দোহাই দেয় তখনও তার ভিতরের একটি ছেলেমানুষ বসে হাসে আর ভেংচি কাটে। কোন কোন সময় সে নিজেই তা টের পায়। বেশির ভাগ সময় শুধু অন্যের চোখেই তা ধরা পড়ে। তার বিসদৃশ আচরণ বিসদৃশ চাল-চলনের মূলে হয়ত লুকিয়ে আছে তার এই বিসদৃশ দুই মূর্তি।

মায়ের সঙ্গে মানুষের যে দেহগত একান্ত সান্নিধ্য সেই সান্নিধ্য সে আর কারো কাছে পায় না, যৌবনে গিয়ে স্ত্রীর কাছে নতুন রূপে ফের সেই দেহরস উপভোগ করে। জননী আর জায়া। পুরুষের দুই ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী। সে একজনকে ছেড়ে আর একজনকে পায়। তাই বোধ হয় এদের কলহের ক্ষান্তি নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ নেই।

মার সঙ্গে অতীতের সেই গাঢ় গভীর আর মধুর সম্পর্কের কথা আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে বিমলেন্দুর। বাবা আর মার মধ্যে মাকেই তার পছন্দ হল বেশি। তখন মার স্বভাব ছিল নম্র, স্নিগ্ধ, শান্ত। মা ছিলেন সমস্ত কোমলতা, লালিত্য, লাবণ্য, নারীত্বের প্রতীক, সংসারে মার কষ্টটাই বেশি করে চোখে পড়ত বিমলেন্দুর। তাঁর কাছে বাবাকে মনে হত অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, দিগ্বিজয়ী নয়, দুর্ধর্ষ দস্যু। সেই দস্যুর হাত থেকে মাকে উদ্ধার করার স্বপ্ন দেখতেন বিমলেন্দু। নিজেকে ভাবতেন রূপকথার

দুঃসাহসী বীর রাজপুত্র বলে। যে পতি নয় শুধু সেনাপতি, ধারালো তরবারি যার হাতে, দুঃখিনীর দুঃখমোচনের ভার যার ওপর। তারপর সেই শৈশবের রূপ-কথার রূপ পালটালো, বাবা আর মায়ের মধ্যবর্তী বলে নিজেকে বুঝতে শিখলেন চিনতে শিখলেন বিমলেন্দু, বাবা তার পর নন, পরম আপনজন একথা টের পেলেন, তবু তারপরেও দীর্ঘকাল ধরে মার ওপর তাঁর পক্ষপাত অটুট রইল। মনে আছে পনের-ষোল বছর বয়স পর্যন্ত মা তাঁর হাতে পায়ে মুখে গলায় সাবান মাখিয়ে স্নান করাতেন, কারণ তেল আর সাবানের ওপর বিমলেন্দুর বিশেষ প্রীতি ছিল না। স্নানের জন্যে নদী কি পুকুরের প্রচুর জল আর একখানা গামছাই তার কাছে যথেষ্ট ছিল। তাই তার দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখবার ভার মাকেই নিতে হত। ঝিঙের খোসায় সাবান মাখিয়ে তার পিঠের ময়লা তুলতে তুলতে পুকুরের ঘাটে তালের পৈঠার ওপর বসে তিনি বিমলেন্দুর পিছন থেকে হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা খোকা, তোর লজ্জা করে না? এই বুড়ো বয়স অবধি তোকে আমার সাবান মাখিয়ে দিতে হয়। কই অমুকে তো তা দিতে হয় না। এমন যে টুনু-রুনু, তোর চেয়ে কত ছোট, তারাও নিজেরাই নিজেদের শরীরের যত্ন করতে পারে।'

বিমলেন্দু এসব অনুযোগের কোন জবাব না দিয়ে শুধু হাসতেন। আর মায়ের স্নেহস্পর্শ অনুভব করতেন সর্বাঙ্গে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘুমোবার সময় মাথায় হাত বুলিয়ে না দিলে বিমলেন্দুর ঘুম আসত না। খাওয়ার সময় কাছে এসে না বসলে পেট ভরতো

না। কলকাতায় এসে যখন কলেজে ভর্তি হলেন মার কথা প্রায়ই মনে পড়ত। লম্বা লম্বা চিঠিতে তখনকার দিনের সুখ-দুঃখের কথা লিখতেন। তা দেখে বাবা আবার রাগ করতেন, 'অত যদি চিঠি লিখিস, পড়াশুনো করবি কখন ? পরীক্ষা তো আর পত্রসাহিত্যের পরীক্ষা হবে না!'

একবার হাতখরচ বাঁচিয়ে মার জন্যে একখানা শাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। তা দেখে মার সে কি আনন্দ! তারপর বড় হয়ে তার চেয়ে অনেক ভালো আর দামী শাড়ি মাকে কিনে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেদিন যে আনন্দ দিয়েছিলেন, আনন্দ পেয়েছিলেন, তেমন আর হয়নি। এখনকার দেওয়া যেন প্রয়োজনের দেওয়া, কিন্তু সেদিনের সেই দেওয়ার মধ্যে অপ্রয়োজনের অপ্রত্যাশিত আনন্দ ছিল।

তারপর বড় হয়ে চাকরি-বাকরি পেয়ে বিয়ে করলেন বিমলেন্দু। বিয়েতে মার আগ্রহই বেশী ছিল। অত অল্প বয়সে, অত অল্প মাইনেয় বিয়ে করবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না তাঁর। তিনি আপত্তিও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা কুলদাবাবু বললেন, 'আমি নিশিবাবুকে কথা দিয়েছি। লোকের কাছে কথা দিয়ে যদি কথাই না রাখতে পারি তাহলে আর সংসারে থেকে লাভ কি! আমি চলে যাব এখান থেকে।'

মাও এসে হাত ধরলেন, 'লোকের কাছে তোর বাবার মুখ হেঁট হবে, এই কি তুই চাস! এ লোকও তো আবার যে-সে

লোক নন—স্কুল-কমিটির সেক্রেটারী। এখানে আমাদের শত্রু অনেক। কিন্তু নিশিবাবু সহায় থাকলে কত সুবিধে। এখানকার পুরনো উকিল। কত প্রভাব প্রতিপত্তি। মেয়েটিও সুন্দরী। ইন্দুকে তুই তো দেখেওছিস। আমাদের বাসায় কতবার এসেছে। একবার তো তোর টেবিলই গুছিয়ে দিয়ে গেল। আমাকে বলল—মাসীমা, বড় এলোমেলো হয়ে আছে টেবিলটা। ঠিক করে রাখব? আমি আর না করি কি করে। জানিস, ভিতরে ভিতরে সে তোকে—'

বিমলেন্দু সেখান থেকে লজ্জিত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন, 'যাক যাক, যত সব বাজে বানানো কথা বলতে হবে না তোমাকে।'

কিন্তু মা উঠে যাবার পর টুনু আর রুনু দুই বোন এসে বিমলেন্দুকে ঘিরে ধরেছিল। টুনু তখন গার্লস হাইস্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে আর রুনু ক্লাস এইটে। বাবা দুজনের জন্যেই বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজছেন। একজনের সতের পার হয়ে গেছে, আর একজনের পনের। কিন্তু রঙ কালো বলে তেমন ভালো সম্বন্ধ জুটছে না।

টুনু হেসে বলল, 'সত্যিই দাদা, ইন্দুদি তোমাকে—' বলে মুখে আঁচল চেপে হাসতে লাগল।

রুনু বলল, 'এ সম্বন্ধ হবেই। বিমল যোগ ইন্দু বিমলেন্দু। সন্ধি তো হয়েই আছে। এখন শুধু বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। দাদা সূত্রটা বলব?'

বিমলেন্দু ছুই বোনকে তাড়া দিয়ে বলল, 'যা-যাঃ, খুব ইঁচড়ে পাকা হয়েছিস। টার্মিনাল পরীক্ষায় কি রকম নম্বর পেয়েছিস, নিয়ে আয় দেখি।'

কিন্তু বোন ছুটিকে ধমকে তাড়ালেও ইন্দিরার কথা অত সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না বিমলেন্দু। একটি মেয়ে অলক্ষ্যে এসে তাঁর টেবিল গুছিয়ে দিয়ে গেছে, একটি মেয়ে বিমলেন্দুর সম্বন্ধে তাঁর মনের গোপন ছুর্বলতার কথা জানিয়েছে, এর চেয়ে বড় বিস্ময়কর, বড় রোমাঞ্চকর ঘটনা যেন পৃথিবীতে আর কোনদিন ঘটেনি কি ঘটবে না—তখন সেইরকমই মনে হয়েছিল বিমলেন্দুর। এর আগে দেশী বিদেশী কত নভেল নাটক পড়েছেন, বইয়ের নায়কদের কত পূর্বরাগ অনুরাগের কাহিনী নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসে গড়া একটি মেয়ের মনের খবর পাওয়ার সৌভাগ্য এর আগ তাঁর কোনদিন ঘটেনি। হোক না সে মেয়ে বৃদ্ধ কূটবুদ্ধি উকিলের পঞ্চম কন্যা, পরিবারে অনাদৃতা, বাপ-মার ছুশ্চিন্তার আধার। হোক না তার বিদ্যা স্কুলের গণ্ডির মধ্যে, আর বুদ্ধি সাংসারিক ঘরকন্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবু তার সেই মনের স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষাকে অপরিসীম বলে মনে হয়েছিল বিমলেন্দুর। যদিও সে একই শহরের অধিবাসিনী তবু দূর-দূরান্তের কল্পলোকে রেখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। আর তার ফলে তাঁর মনের সমস্ত দৃঢ়তা, সমস্ত আপত্তি আর অনিচ্ছা ভেসে গিয়েছিল। এই নিয়ে পরে তিনি যথেষ্ট অনুতাপ করেছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাও যে অনুতাপ করবেন এটা আশা করেননি। যে মা ইন্দুকে পছন্দ করেছিলেন, যিনি সাধ করে তাকে ঘরে এনেছিলেন, তার সঙ্গেই সবচেয়ে খারাপ সম্পর্ক গড়ে উঠল বিমলেন্দুর মার। তিনি যখন দেখলেন ইন্দু শুধু একদিনের টেবিল গুছিয়েই খুশি থাকছে না, চিরদিনের ঘর গুছাবার ভার নিয়েছে, ছেলের সমস্ত মন অধিকার করে নিচ্ছে, তখন আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। টুনু-রুনুও ইন্দুর পিছনে লাগল। তাদের বিয়ে দিতে যত দেরি হতে লাগল ততই তারা মায়ের কাছে বউদির নিন্দা-মন্দে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। রাতদিন কলহ-কেলেঙ্কারি ঝগড়া-ঝাঁটি। আর ইন্দিরার চিঠিতে তার বিস্তৃত বিবরণ। দাম্পত্য পত্রের অর্ধেকের বেশি জুড়ে রইল সংসারের পাঁচজনের বিরুদ্ধে নালিশ আর অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি। শেষ পর্যন্ত মেস ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করলেন বিমলেন্দু। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটি যেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তাঁর আর তাঁর স্ত্রীর নিন্দা-মন্দে শুধু তাঁদের গোকুলপুরের বাসা নয়, পুরো শহরটাই যেন মুখর হয়ে উঠল। বিমলেন্দুর মনে হল বাবা আর মার সঙ্গে চিরদিনের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তিনি। সংসারের এই দুই টুকরো কোনদিনই আর জুড়বে না। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই বড় মূল সংসারকে নিজের ছোট শাখাটির সঙ্গে এনে বেঁধে দিয়েছেন বিমলেন্দু কিন্তু এখনো তাঁর মনে হয় ভিতরে ভিতরে সব যেন জোড়া লাগেনি। বাবা-মা তাঁর সঙ্গে একান্নবর্তী হয়েও যেন আলাদা হয়েই আছেন। আর কথায়

কথায় মা এখনও সেই খোঁটা দেন। ঝগড়া লাগলেই বলেন, 'তোমাকে জানিনে? বিয়ের পর দু'বছর যেতে না যেতে আমার ছেলেকে তুমি পর করে দিলে। তাকে নিয়ে আলাদা হয়ে সংসার পাতলে। তুমি তো আমার সেই বউ!'

ইন্দিরা প্রতিবাদ করে, 'বারে, হোটেল-মেসে খেয়ে খেয়ে আপনার ছেলেরই তো স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেল, ক্রনিক আমাশায় ধরল, সেইজন্তেই তো—'

বিমলেন্দুর মা বলেন, 'থাক থাক, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না তোমাকে। তোমাদের মত ইস্কুল-টিস্কুলেই না হয় না পড়েছি, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধ তাই বলে যে আমাদের একেবারেই কিছু নেই সেকথা ভেব না বউমা।'

সেই পুরনো খোঁটা, সেই পুরনো গঞ্জনা ইন্দিরাকে এখনও শুনতে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দুর মন মার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। লালিত্যে লাবণ্যে কোমলতায় মেশা মেশা যে নারীর যে আদর্শরূপ আর আদর্শ স্বভাব মাতৃমূর্তির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেই মূর্তি বহুদিন আগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সেই উজ্জ্বলবর্ণ ধুয়ে মুছে এখন প্রায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে। মার মুখে ইন্দিরার সুখ্যাতি বিমলেন্দু কদাচিৎ শুনতে পান। দুই বোনের বিয়ের সময় বিমলেন্দু যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিতে পারেন নি। পরিবারে স্বামীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ইন্দিরা যে তার গায়ের অর্ধেক গয়না খুলে দিয়েছিল,

সে কথা মা কিন্তু ভুলেও উল্লেখ করেন না। সে কথা বিশ্বাসই করেন না তিনি। বলেন, 'ওসব বানানো গল্প। বউকে আমাদের চোখে বড় করবার জন্যে খোকা নিজে ওইরূপ কথা বানিয়েছে। আমি যেমন ছেলেবেলায় বানিয়ে বানিয়ে ওর কাছে গল্প বলতাম, ও-ও সেই বিদ্যা শিখেছে। শোধ নিচ্ছে আমার ওপর। ওই বউ দেবে গায়ের গয়না? আমি যেন ওকে চিনিনে।'

মার সঙ্গে সেই সারাক্ষণের সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা, অবেগের সম্পর্ক আর নেই বিমলেন্দুর। তবু মাকে অন্য কেউ নিন্দা করলে সয় না। পরিবারের বাইরের কারো সমালোচনা তো তাঁর অসহ্য লাগেই, শাশুড়ীর বিরুদ্ধে ইন্দিরার নালিশ অভিযোগকেও সহ্য করতে পারেন না বিমলেন্দু। এই সব মুহূর্তে ইন্দিরা তার রূপ লাবণ্যকান্তি কোমলতা হারিয়ে বিমলেন্দুর চোখে বড়ই ছোট হয়ে যান। মানুষ কেন এত ছোট হবে, কেন এত অনুদার আর সঙ্কীর্ণ হবে? কেন পূর্বের আক্রোশ সে ভুলতে পারবে না? সারাজীবন ঈর্ষা আর হিংসার বোঝা পিঠের ওপর বয়ে নিয়ে চলবে?

বিমলেন্দুর বন্ধু জয়দেব যখন তাঁর মাকে নিন্দা করেন, তখন নিশ্চয়ই মনে রাখেন না যে তিনি তাঁর বন্ধুর মা। মাতৃ-নিন্দা বন্ধুর কাছে যে দুঃসহ তা তাঁর স্থূলরুচি উকিলবাবু নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন না। তাছাড়া জয়ন্তীকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারিটা হল তাতে বিমলেন্দুর মার কোন প্রত্যক্ষ হাতও ছিল না। তাঁর মতামতের দামই বা কার কাছে ছিল? তবে

তিনি এ ব্যাপারে বিমলেন্দুর স্ত্রী ইন্দিরা আর তাঁর ছোট ভাই অমলেন্দুকেই সব সময় সমর্থন করেছেন। বিমলেন্দুর সাংসারিক বুদ্ধির ওপর তাঁর কোন আস্থা ছিল না, আজও নেই।

ভাই আর স্ত্রী। জয়ন্তীদের ঘটনায় বিমলেন্দুর পরিবারে যে দুজনের সবচেয়ে প্রভাব বেশি তারা হল অমল আর ইন্দিরা। অবশ্য এও বাইরের প্রভাব। ওদের জীবন-কাহিনীর নায়ক-নায়িকা ওরা নিজেরাই—গোবিন্দ বিশ্বাস আর জয়ন্তী। তাদের সুখ-দুঃখ এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের জন্যে তারা নিজেরা যতখানি দায়ী তেমন আর কেউ নয়। কিন্তু বিমলেন্দুর ভাই অমল আর স্ত্রী ইন্দিরা যদি তাদের নিজেদের জেদ অনুযায়ী না চলত, যদি নিজেদের রুচি বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য দিয়ে এই একটি সামান্য ছোট ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ না করত, আর নিজেদের ইচ্ছা অভিরুচি বিমলেন্দুকে দিয়ে সমর্থন না করিয়ে নিত, তাহলে ঘটনার ধারা কি অন্যরকম ভাবে বইত না? জয়ন্তীর জীবনটা কি অন্যরকম হতে পারত না? শুধু অমল আর ইন্দিরাকে দোষ দিলেই বা কি হবে? এ ব্যাপারে বিমলেন্দুর নিজের দায়িত্বই কি একেবারে কম? জয়দেব বন্ধু বলে বিমলেন্দুকে যেভাবে বেকসুর খালাস দিয়েছেন, তিনি নিজেকে কি তেমন দোষমুক্ত দায়মুক্ত বলে ভাবতে পারেন? বেশির ভাগ কোন দোষের জন্য তাঁর দ্বিধা-দুর্বল চিত্তকেই কি দায়ী করা সঙ্গত নয়? কোন ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারার অক্ষমতা, সব বিষয়ে এক পা

এগুনো দু-পা পিছনো আর শেষ পর্যন্ত অন্যের মত কি অন্যের জোরাল ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণই যাঁর স্বভাব তাঁকে একটু নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে বিমলেন্দু নির্দোষ ভাবতে পারেন না। সবাই বলে অমলেন্দু বিমলেন্দুর অনুজ কিন্তু বিমলেন্দু অমলেন্দুর অনুগামী। পরিবারের বেশির ভাগ ব্যাপারে অমলেন্দুর আদেশ নির্দেশ সুস্পষ্ট, তার কর্তৃত্ব, তার পরিচালনা একটা খোলা পথ ধরে চলে। তা সরীসৃপগতিতে এগোয় না, পিছোয় না, কি থেমে থাকে না। জয়দেব যে তার ওপর চটা, তার কারণ জয়দেবের দুর্বলতার কথাও সে জানে এবং বিমলেন্দুর এই উকিল বন্ধুর মতই মুখের ওপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। শুধু ঈর্ষা দ্বেষ ক্রোধকে মনের মধ্যে পুষে রেখে নিজের শান্তি স্বস্তি শুষে নিতে দেয় না। অমলেন্দু ভাষার রূঢ়তায়, চোখের রক্তিমায়, হাতের বদ্ধমুষ্টির মুদ্রায় নিজের ক্রোধকে যেমন প্রকাশ করে, তেমনি তার ইচ্ছা আর উদ্দেশ্য-কেও কাজে রূপ দেওয়ার জন্যে এগিয়ে যায়। তাছাড়া বিমলেন্দু যেমন শুধু পরিবার-সর্বস্ব, অমলেন্দু তা নয়। সংকীর্ণ অর্থে অমলেন্দু বরং পরিবারহীন, কারণ সে অকৃতদার। কিন্তু বাপ মা দাদা বউদির পরিবার ছাড়াও একটি বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে অমলেন্দুর যোগাযোগ আছে। পাড়ার লাইব্রেরী, এথলেটিক ক্লাব, আর দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজার কমিটির যে সে একজন পুরোধা তাই নয়, অনেক পরিবারের বেকার ছেলেদের সে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, অনেক অনূঢ়া মেয়ের বর আর

অনেক বিধবা মেয়ের কর্মসংস্থান তার সহায়তায় হয়েছে, নিজের শক্তি সামর্থ্য চিন্তা ভাবনাকে সে শুধু তার দাদার মত নিজের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি, তাকে আরও বাড়তে দিয়েছে ছড়াতে দিয়েছে। এমন মানুষ সংসারের নেতৃত্ব নেবে না তো নেবে কে ? যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তার ভুলচুক-কেও মাঝে মাঝে সহ্য করতে হয়, অন্যের উপকারে যে উদ্যত আর উদ্যমশীল, প্রচলিত অর্থে তার সুশীল না হলেও চলে। তার মুখের ভাষা একটু রূঢ় হলে কিছু ক্ষতি হয় না যদি তার মনের অভিপ্রায় সদর্থক আর সকর্মক হয়। বিমলেন্দু স্বীকার করেন, তাঁর ছোট ভাইয়ের স্বভাব-প্রকৃতি তাঁর চেয়ে আলাদা। অবশ্য অমলেন্দুর স্থূলতা, রূঢ়তা, রুক্ষতা— যাকে সে পৌরুষের পক্ষে অপরিহার্য মনে করে আর যার জন্যে লোকে তাকে ভয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে চলে, ছোট ভাইয়ের এই বৈশিষ্ট্যগুলিই বরং অপছন্দ করেন বিমলেন্দু। কিন্তু করলে কি হবে, সব মানুষ তো আর তাঁর নিজের পছন্দমত গড়ে উঠবে না। দোষ-গুণের আনুপাতিক সংমিশ্রণে একেক মানুষ একরকম। যত মানুষ ঠিক তত টাইপ, ততটি ছাঁচ। বিমলেন্দুর সাধ্য নেই এই ছাঁচের বিন্দুমাত্র অদলবদল করেন। তিনি স্রষ্টা নন, সংস্কারক নন, শুধু দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে এই জগতে এসেছেন। যা তাঁর দেখতে ভালো লাগবে না, তার দিক থেকে তিনি বড় জোর চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু চোখের পক্ষে অরুচিকর বস্তুকে রূপান্তরিত করবার স্থানান্তরিত করবার সাধ্য তাঁর নেই।

কাউকে তিনি বদলাতে পেরেছেন? না নিজের ভাইকে, না স্ত্রীকে, না তাঁর নিজের ছুটি মেয়েকে? যারা তাঁর চোখের সামনে শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠেছে, তাদেরও তিনি বিন্দুমাত্র বদলাতে পারেননি। সব চেয়ে আশ্চর্য, নিজেকেই তিনি নিজের পছন্দমত করে গড়ে তুলতে পারেননি। বেশি কিছু নয়, তাঁর চরিত্রের মধ্যে আর একটু দৃঢ়তার মিশ্রণ, আর একটু ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তিনি আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তা পেরে ওঠেননি। সবাই তাঁকে মাটির মানুষ বলে জানে এবং সুখ্যাতির ছলে তা বলেও। কিন্তু এই বিশেষণটি তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি জানেন তিনি শুধু মাটি নন, একেবারে কাদা মাটি, যে উপাদানে কোন মূর্তি গড়া যায় না, রূপ গড়া যায় না। তিনি নিজের মধ্যে খানিকটা লোহা আর ইস্পাত নিয়ে আসতে চান। আনতে গিয়ে দেখেন তা তাঁর পক্ষে একান্তই অসাধ্য। তাঁর ক্রোধ ব্যর্থ, ক্রোধের প্রকাশ হাস্যকর। তিনি তা জানেন, তাই যথাসাধ্য ক্রোধকে বাদ দিয়ে চলতে চান। আর সেই ক্রোধ প্রকাশের সোজা রাস্তা না পেয়ে বক্রপথে তাঁর নিজের অন্তর্জীবনকে অশান্ত আর বিপর্যস্ত করে তোলে। বিমলেন্দু জানেন সব নিয়েও সব থাকা সত্ত্বেও তিনি যতটা সুখী, তার তুলনায় ঢের ঢের বেশি সুখী এই আধা-সন্ন্যাসী আধা-গৃহী অমলেন্দু। ওর জগতটা খুব সহজ সরল আর স্বচ্ছ। অন্ততঃ ওর নিজের কাছে। ওর আদর্শ আর লক্ষ্য স্পষ্ট। ওর আত্ম-বিশ্বাস আত্মপ্রীতি দুইই আছে—বিমলেন্দুর যা একান্ত অভাব।

অথচ দুজনে একই সঙ্গে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এতটা বৈপরীত্য ছিল না। তাঁরা দুজনে ওপরে নিচে পড়লেও ছেলেবেলায় একই মাঠে তাঁরা খেলেছেন, একই দলের ছেলেদের সঙ্গে মিশেছেন, একই যাত্রা-থিয়েটারের আসরে মুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখেছেন, সার্কাসের তাঁবুর ধারে লুব্ধভাবে ঘোরাঘুরি করেছেন, এমন কি বাবার নির্দেশে একই ধরণের জামাজুতো পরেছেন। সত্যি বিমলেন্দু ভাবতেই পারতেন না, অমল তাঁর চেয়ে অন্য রকম হবে। ও যে অন্য ধাতুতে গড়া সে সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না। কিন্তু আস্তে আস্তে তাই হল। বিমলেন্দু যেমন মার পক্ষ নিলেন, অমলেন্দু নেন তেমনি বাবার দিক। বাবাকে সে ভালোবাসত তাঁর দোষগুণ সমেত। কুর্বন্নপি ব্যলিবানি যঃ প্রিঃ প্রিয়ঃ এব সঃ। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছা কি অর্ধ ইচ্ছায় হোক, বাবার ছাঁচে সে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করল। সে বলল, 'বাবা একটু বাড়াবাড়ি করেন বটে, কিন্তু ক্লাসে কড়া না হলে ডিসিপ্লিনও রাখা যায় না। বাবার ক্লাসে কেউ টুঁ শব্দটিও করতে পারে না, আর রাধামোহনবাবু খুব লিবারল বলে তাঁর ক্লাসে শেষ পর্যন্ত মাছের বাজরে বসে। যতই ভালো পড়ান সে পড়ানোর কোন দাম নেই, কারণ কেউ তা শোনে না।'

বিমলেন্দুর বাবা যখন দুষ্টু ছেলেদের হাতে মার খেলেন, তখন থেকে দুইভায়ের মতবিরোধ আর দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ

আরো বাড়তে লাগল। বাবার লাঞ্ছনায় বিমলেন্দু ঠিক তাঁর মতই কাঁদলেন, কিন্তু অমলেন্দুর চোখ দিয়ে আগুন ছুটল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সে একা তখনই লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়ে আর কি! অনেক করে তাকে থামানো হল। বাবার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, হাতে ব্যাণ্ডেজ, মারের চোটে মুখখানা বেঁকে গেছে। তবু দেহের অত কষ্ট আর যন্ত্রণা নিয়েও তিনি ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপর পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'ওই আমার ছেলের মত ছেলে। ওই আমার নাম রাখবে। দুষ্টের দমনের জন্যে আমি বেত ধরেছি, তুই লাঠি ধরিস বাবা। অনাচার অত্যাচার করে কেউ যেন এড়িয়ে যেতে না পারে।'

এই ঘটনা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে পরে আরো আলোচনা হয়েছে। বিমলেন্দু একদিন বলেছিলেন, 'বাবা তাঁর চালচলন শোধরালেন, কিন্তু তাঁকে মার খেয়ে শোধরাতে হল এ বড় দুঃখের।'

অমলেন্দু বলেছিল, 'তার চেয়ে দুঃখের কথা, তুমি ব্যাপারটাকে কত সহজভাবে নিয়েছ। বাবা যে মরে যেতে পারতেন একথা তোমার মোটেই মনে হয়নি। এই মার যে আমাদের সবাইর পিঠে পড়েছে, তাঁর অপমানে যে আমাদের প্রত্যেকের অপমান সে কথা তুমি ভেবে দেখনি। মা বলে তোমার মন খুব নরম। কিন্তু আমি দেখছি বাবার ব্যাপারে তুমি ভারি শক্ত, রীতিমত নিষ্ঠুর। তাছাড়া টিচার যত কড়াই

হন, কোন ছাত্রের অধিকার নেই তাঁকে মারবার।'

বিমলেন্দু বলেছেন, 'অধিকার আছে একথা কে বলে। কিন্তু সংসারে যাঁরা সবল, যাঁরা গুরুজন, যাঁরা বড়, তাঁরা যদি সত্যিকারের বড়র মত ব্যবহার না করেন, ছোটরা আরো ছোট হয়ে যায়। তারা চরম অনধিকার চর্চা করে বসে। তাদের সেই বিদ্রোহের মধ্যে যুক্তি বুদ্ধি মায়া মমতা কিছু থাকে না। সেই জন্যেই তো আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়। সেই জন্যেই তো বড়রা ধর্মাচরণ করে ছোটদের ধার্মিক করে তুলবেন এইটা লোকে আশা করে।'

এই আলোচনা যখন হয়েছিল তখন তুজনেই কলেজের ছাত্র। অমলেন্দু কিন্তু কিছুতেই ও যুক্তি মানেনি। বাবার দোষটা সে মোটেই বড় করে দেখেনি। বরং বাবাকে পুরোপুরি সমর্থন না করার জন্য দাদাকেই দোষী করেছে। তাঁর এই মতামতের ভিতর থেকে বাবার ওপর বিমলেন্দুর যথেষ্ট পরিমাণে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসার অভাব খুঁজে বের করেছে। অমলের ধারণা মানুষ কখনই নিরপেক্ষ হয় না, হতে পারে না। সে শুধু নিরপেক্ষ হওয়ার ভান করে। ন্যায়বিচারের নামে মানুষ সব সময় আত্মমত, আত্মরুচি এবং আত্মীয়জনকে সমর্থন করে যায়। মুখে না করলেও কাজে তাই করে। বাবাকে যে ওভাবে খুঁটে খুঁটে বিচার করেন বিমলেন্দু সে তাঁর মনে বাবার সম্বন্ধে বিরূপতা আছে বলে, কি যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসা নেই বলে। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বিমলেন্দু অমন নির্মম হতে

পেয়েছেন ?

বিয়ে সম্বন্ধে বিমলেন্দুর মতামতের অনিশ্চয়তাও অমল সমর্থন করেনি। অন্য অনেক ব্যাপারে বাপের মতের বিরোধিতা করে, শুধু বিয়ের প্রস্তাবে তাঁর একান্ত বাধ্য হওয়াতে দাদাকে সে মৃদু ঠাট্টা-তামাসা করতেও ছাড়েনি। দুটি বয়স্থা অনূঢ়া বোনের বিয়ের ব্যবস্থা না করে দাদা যে আগেই নিজে বিয়েটি করে বসলেন তার জন্যে বিরক্ত এমন কি অসন্তুষ্ট হয়েছে। আড়ালে প্রকাশ্যে আলোচনা সমালোচনায় তার সেই বিরূপতা গোপন থাকেনি। কিন্তু অমল সবচেয়ে উত্যক্ত হয়েছে চাকরি পাওয়ার পরেই বিমলেন্দু স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাসা করায়। শাশুড়ী-বউতে ঝগড়া বিবাদ কোন্ সংসারে না হয় ? তাই বলে বৃদ্ধ বাপ-মার কাছ থেকে স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে ? একি একান্নবর্তী পরিবারের ওপর চরম অকর্তব্য নয় ? এতে কি স্ত্রীর অযৌক্তিক আবদার আর স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না ? এই স্ত্রৈণতার পরিণাম কি ভালো হতে পারে ? বাপ-মার পক্ষ নিয়ে রূঢ়ভাবে দাদার সমালোচনা করেছে অমল। বিমলেন্দু হেসে বলেছেন, কি কখনো কখনো চিঠিতে লিখেছেন, 'বিয়ে করলে তুমিও ওই রকম করতে। স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ স্বামীকে না দেখলে চলে না। যেহেতু সে আমার স্ত্রী, সেইজন্যেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমি শুধু চোখ বুজে থাকব, তার ওপর কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ আহ্লাদের ব্যবস্থা করব না,

নীতির নামে, একান্নবর্তী পরিবার-প্রীতির নামে এমন যুক্তিহীনতা আমি সমর্থন করিনে। তাছাড়া মার কাজ করবার শক্তি আছে, টুনু-রুনু তাঁকে সাহায্য করছে, এই সময় ইন্দু যদি কলকাতার বাসায় ছ'মাস থাকে, পৃথিবী রসাতলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

নিজের ক্রুদ্ধ মনের সেই রূঢ়ভাষা এখনো মনে আছে বিমলেন্দুর। তারপর সেই চিঠি ডাকে দেওয়ার পর কি অনুতাপ আর আত্মগ্লানি। স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া হল। বললেন, 'তোমার জন্যেই যত এই অনর্থ।' ছুটে চলে গেলেন বউবাজার পোস্ট অফিসে। ডাকে দেওয়া চিঠি ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু সে চিঠি ফেরৎ পাওয়া গেল না। তা ততক্ষণে মেলব্যাগে বন্দী হয়ে পড়েছে। বাসায় ফিরে এলে ইন্দিরা বলল, 'তুমি কি পাগল? চিঠি ছেড়ে দিয়ে তার পিছনে দৌড়চ্ছ! তার চেয়ে আর একখানা চিঠি লিখলেই হয়। বেশ তো, তুমি যদি লজ্জায় লিখতে না পার আমি লিখছি, আমি মোলায়েম করে লিখে দিচ্ছি ঠাকুরপোকে।'

ইন্দিরার যে কথা সেই কাজ। তখনই প্যাড নিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেল,—"ভাই ঠাকুরপো, তোমার দাদা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তোমাকে এক আচ্ছা কড়া চিঠি লিখে ফেলেছেন। মানে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। জানোই তো ওঁর স্বভাব—।"

ইন্দিরার জোর আছে মনে। সে অমন জবরদস্ত মেয়ে

না হলে বিমলেন্দু অমন তাড়াতাড়ি কলকাতায় বাসা করতে পারতেন না। 'করব কি করব না' ভাবতে ভাবতেই দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যেত। বিমলেন্দুর সেই প্রথমবারের বাসা অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ইন্দিরা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় বাসা তুলে দিয়ে বিমলেন্দু তাকে ফের বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে নিজে মির্জাপুরের মেসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কিন্তু তাই বলে তাঁর সম্বন্ধে অমলের ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অমল তাঁকে দুর্বলচিত্ত বলেই ধরে নিয়েছে। সেই সঙ্গে এও ভেবেছে, নিজের সবল দুই বাহু দিয়ে দাদাকে রক্ষা করতে হবে, তাঁর নিজের দৃঢ় মন, নির্মল বুদ্ধি এবং স্পষ্ট আদর্শ দিয়ে তাঁকে পরিচালনা করতে হবে। জেলা সহরের কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে এবং সেখানকার জর্জ কোর্টে কিছুদিন জজসাহেবের অস্থায়ী পি-এর পদাধিকারী হয়ে থেকে অমলও চলে এল কলকাতায়। দাদার মেসে উঠল। সীট পেল ঠিক পাশের তক্তাপোশে। তখন দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা কি এখন সেই ভাবেই আছে? তখন দুজনের মধ্যে সাহিত্য রাজনীতি নিয়ে যে সব আলোচনা হত, এখন তা কদাচিৎ হয়। এখন এক বাড়িতে বাস করেও দুজনের দুই ধরণের জীবন ধারা। বিমলেন্দু একান্তভাবে দারাপুত্রে পরিবৃত, তাদের সুখ-দুঃখে সমাচ্ছন্ন, আর অমল শুধু বিদেশী চা ব্যবসায়ীর

অফিসের মেজবাবু নয়, শহরের অনেক ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। বরং নিজেদের পরিবারের সঙ্গেই তার যোগাযোগ এখন পরোক্ষ। সে শুধু বউদির হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়েই খালাস, পারিবারিক অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ নির্দেশ দিয়েই নিশ্চিন্ত। নিজের পরিবারের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ আর তেমন নেই অমলেন্দুর। আর সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দু আর তার মধ্যে ব্যবধানও গড়ে উঠেছে। এমন ব্যবধান এমন অনাত্মীয়তা মাঝে মাঝে অনুভব করেন বিমলেন্দু যে ওর হাত থেকে বেশি টাকা নিতেও তাঁর অভিমান হয় কুণ্ঠা হয়। তিনি মাঝে মাঝে ভাবেন অমলের কাছ থেকে শুধু ওর খোরাকির টাকাটা ছাড়া বেশি টাকা নেবেন না। তার দান, তার অনুগ্রহ কেন সারাজীবন হাত পেতে নেবেন বিমলেন্দু? তার চেয়ে তিনি আরো দরিদ্র হয়ে থাকবেন, একবেলা খাবেন, দোতলার ভাড়া বাড়িতে না থেকে বস্তিতে গিয়ে থাকবেন, সেও ভালো। ভাইয়ের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এই ধরণের উগ্র অভিমান হয় বৈকি বিমলেন্দুর, বিশেষত যে মাসে দশবিশ টাকা কম দেয় অমল, সে মাসে তাঁর অভিযোগ অনুযোগ আরো বেড়ে যায়। বিমলেন্দু বলেন, 'তুই তোর টাকা দেশের কাজে দে সেই ভালো। আমাকে দিতে হবে না।'

অমলেন্দু হয়ত একটু আহত হয় কিন্তু আঘাতটাকে হাসির আবরণে ঢাকতেও তার দেরি লাগে না। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'তাই নাকি? আমার দেশ বুঝি তোমার দেশ না?

কিন্তু তোমার বাবা-মা ঘটনাক্রমে আমারও বাবা-মা। আর সেই সুবাদে তোমার স্ত্রী আমার বৌদি, তুই মেয়ে আমার ভাইঝি, তাদের জন্য আমার কিছু ব্যায়বরাদ্দ করতে হয় বৈকি, মিথ্যেই আমাকে তুমি ঠাট্টা করছ দাদা। এই বিরাট দেশের কাজ করবার মত সাধ্য কি সামর্থ্য আমার নেই। আমি তা করতেও চাইনে। শুধু নিজেদের দরিদ্র পরিবারের মত আরো দু-একটা দুঃস্থ পরিবার যখন ঘাড়ে এসে পড়ে, তাদের জন্যে নড়াচড়া করি ওই পর্যন্ত। শুধু নিজেদের বাড়ির মধ্যে নিজের ঘরখানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার দম যেন আটকে আসে দাদা—আমি তা পারিনে।'

কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে। মানে বিমলেন্দু নিতান্তই পারিবারিক মানুষ, আপন পরিবারের চিন্তা ছাড়া তাঁর আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু অমলের তা নয়, সে পরিবার বহির্ভূত পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। বিমলেন্দুর মত শুধু চিন্তায় নয়, বাক্যে নয়, কাজেও। এখানেই অমলেন্দুর জিৎ। কিন্তু বিমলেন্দু ভাবেন, অমলও যদি তাঁর মত বিয়ে করত, ছেলেমেয়ে নিয়ে অল্প উপার্জনে সংসার চালাতে হত, তাহলে কি তারও ঘরের বাইরে পা বাড়াবার মত সাধ্য থাকত, হাত-পা কুঁকড়ে তাকেও কি মন গুমরে মরতে হত না? এদিক থেকে অমল সুখী। অনেক সুখী বিমলেন্দুর চেয়ে, তার পারিপারিক দায়িত্ব থেকেও—নেই; অন্তত যে দায়িত্ব পালন না করলেও কেউ তাকে দোষ দেবে না। কিন্তু বিমলেন্দু যদি নিজের পরিবারকে

অভুক্ত রেখে, তাদের আচ্ছাদনের ব্যবস্থা না করে দশজনের কাজের ভার মাথায় নেয়, তাহলে পাড়ার অন্য দশজন ছি-ছি করবে।

অমলেন্দু যাতে বিয়ে করে সেজন্তে তাকে যথেষ্ট অনুরোধ করা হয়েছে। বাবা-মা নিজেরা অনুরোধ করেছেন, বিমলেন্দুও সাধ্য-সাধনা কম করেননি। নিজের বন্ধুদের দিয়ে বলিয়েছেন, ওর বন্ধুদের দিয়ে অনুরোধ করিয়েছেন কিন্তু অমল কিছুতেই বিয়ে করল না। বিয়ের কথায় সে খানিকটা পরিহাসের ভঙ্গীতে বলত, 'বিয়ে করার মানে স্ত্রীর চিরদাসত্ব করা। নামেই পতি আসলে সর্বরকমে পতিত হওয়া। দাদার অবস্থা দেখে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। সবাই তো এক রকম ভাবে শেখে না। কেউ লিখে শেখে কেউ পড়ে শেখে। কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে। দাম্পত্যজীবনের ব্যাপারটা দেখে আর শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আর কিছু জানতে বুঝতে বাকি নেই।'

মা অমলেন্দুর কথা বিশ্বাস করতেন। তিনি ভাবতেন, সত্যিই বুঝি ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর ঝগড়াঝাঁটি হয় বলে, বউকে নিয়ে অনেক পারিবারিক অশান্তি হয়েছে বলে অমল বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু আসল কারণ বিমলেন্দু জানেন। জজের কেরানী হিসাবে কাজ করবার সময় অমল তাঁর সেজ মেয়ে সুমিতাকে ভালোবেসেছিল। অনেক দূর অবধি এগিয়েও ছিল সেই প্রচ্ছন্ন প্রেম। অমলের তখনকার দিনের চিঠিপত্রে

ডায়েরিতে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। সুমিতা ঠিক করেছিল পালিয়ে গিয়ে অমলকে বিয়ে করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয়নি। বাপের শাসন, মায়ের সস্নেহ উপদেশই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সুমিতা লক্ষ্মী মেয়ের মত এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘর-সংসার করছে। আর সেই থেকে স্ত্রীজাতের ওপর এই ধরণের অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ এসেছে অমলের। তার চরিত্রে আরো রূঢ়তা, রুক্ষতা আর কাঠিন্য এসেছে। বিমলেন্দু সবই বোঝেন। অমল অবশ্য দাদার এসব বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা স্বীকার করে না। শুনলে চটে উঠে তারস্বরে প্রতিবাদ করে। সে ব্যাপারের সঙ্গে তার বাকি জীবনের নাকি কোন সম্পর্কই নেই। হয়ত এখন নাও থাকতে পারে। এখন হয়ত তার অনেকখানিই ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা যে ছিল বিমলেন্দু তা জানেন। বহু দিন ধরে, বহু রাত ধরে অমল নিজের মনে সেই দুঃসহ ক্ষতচিহ্ন বহন করেছে। কেউ সান্ত্বনা দিতে চাইলে, কেউ কিছু শুনতে চাইলে কি বলতে চাইলে তাকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে অমল। বিমলেন্দুও সেই অপসারিতদের মধ্যে একজন।

সেই আগের মত প্রথম কৈশোর কি যৌবনের মত এই প্রগাঢ় প্রৌঢ়ত্বে এসে অমলের সেই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আর পান না বিমলেন্দু। একই বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে থেকেও তার সঙ্গে দুস্তর না হোক বিস্তর ব্যবধান অনুভব করেন। বিমলেন্দু

দারাপুত্র পরিবারে পরিবৃত, আর অমল ছোটবড় নানারকম বাইরের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত। একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে একজন অকৃতদারের, একজন নিছক চিন্তাজীবীর সঙ্গে সমাজকর্মীর তফাৎ অনেক। হন না তাঁরা দুই ভাই, কি দুই বন্ধু, কি পিতাপুত্র। পরস্পরকে তাঁদের পক্ষে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয় বলেই বিমলেন্দুর ধারণা। একজন অবিবাহিত সমাজকর্মী একজন বিবাহিত গৃহস্থকে গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণচিত্ত বলে মনে করবেই। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর রাতদিন আপোষ করে মানিয়ে চলবার চেষ্টা অমলের কাছে হাস্যকর না লেগে পারে না। তাঁদের দাম্পত্যকলহ আর অশান্তিকে চায়ের কাপে ঝড়ের চেয়ে বেশি গুরুতর করে দেখা অমলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। বিমলেন্দু সব জানেন, সব বোঝেন।

আজকাল নিচের বৈঠকখানাটা অমলের দরবারের জন্যে সব সময় আটকা থাকে। অফিসে বেরোবার আগে সকালে যে ঘণ্টা দুই আড়াই সময়টুকু অমল পায় সে ওই নিচের বৈঠক-খানাতেই কাটায়। সেখানে ইংরেজী বাংলা চার-পাঁচখানা কাগজ আসে। অমলের কর্মীরা সেই সব কাগজ পড়ে আর নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করে। অমলও সেই সব আলোচনায় সোৎসাহে সাগ্রহে যোগ দেয়। কর্পোরেশন, দেশীয় আইনসভা, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান স্পোর্টিং কিছুই বাদ যায় না। অমল সোৎসাহে সাগ্রহে এবং কখনো কখনো

আবেগদীপ্তভাবে প্রায় সব প্রসঙ্গেই যোগ দেয়। কারণ এগুলি তার সমাজসেবার অঙ্গ। কর্মীদের সঙ্গে সংযোগরক্ষার সেতু। এখানে উচ্চতর কাব্য সাহিত্য, কি ইতিহাস দর্শনের আলোচনা অচল। দোতলায় নিজের ঘরে বসে নিঃসঙ্গভাবে বিমলেন্দু নিজের পুরনো বইগুলো নাড়াচাড়া করেন আর ভাবেন অমলও এক সময় সাহিত্যকে কত ভালোবাসত। প্রথম জীবনে অমলও ছু' একটা ভালো কবিতা লিখেছিল। এখন সে কথা উল্লেখ করলে বলে, 'দাদা দেশে কবিযশপ্রার্থীর অভাব নেই। কিন্তু সত্যিকারের কর্মীর বড় অভাব। Sincere অথচ efficiant এমন ছেলে খুব কমই মেলে। যারা আসে তাদের মধ্যে অনেকেই কাজের অযোগ্য কি কাজে অনিচ্ছুক তা আমি জানি। তবু এদের নিয়েই চলতে হবে, এদেরই গড়েপিটে নিতে হবে। তৈরী মানুষ আমরা আর কোথায় পাব! কাজ করার চেয়ে কাজের মানুষ তৈরী করা কম শক্ত নয়।'

ইলেকসনের মিটিং সেও কাজ, সরস্বতী পূজোর প্যাণ্ডেল তৈরী হবে সেও কাজ। এমন আরো অনেক ধরণের কাজে অমলের এত উৎসাহ দেখা যায় যে বিমলেন্দু অবাক হয়ে ভাবেন ও কি দিনের পর দিন আরো ছেলেমানুষ হচ্ছে! ওর কি বয়েস বাড়ছে না কমছে? নষ্ট করবার সময় ও পাচ্ছে কি করে? মুখের কথা বলতে হয় না, অমল বিমলেন্দুর চোখের দৃষ্টি আর ভ্রূযুগলের কুঞ্চন দেখেই সব বুঝতে পারে। সে হেসে বলে, 'দাদা, এ তোমার ঘরে বসে কাব্যপাঠ নয়। জীবন থেকে

ছেঁকে নেওয়া শুধু রসটুকু মধুটুকু গ্রাসে ভরে এক চুমুকে শেষ করলাম, কাজের ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয় যে, এখানে রোজ অ আ ক খ থেকে শুরু করতে হয়, অ আ ক খ-র পড়ুয়াদের সঙ্গে নিতে হয়। তাদের কাঁধে উঠে যে সব নেতা চলেন তাঁরা ভাগ্যবান। কিন্তু আমরা তো নেতা নই, রাজা-মন্ত্রীর দলের কেউ নই, আমরা সেপাই-সান্ত্রী। আমরা এদের হাত ধরে চলি, আমরা এদের পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটি। এখানকার পাঠশালার রীতিনীতি আলাদা দাদা। তোমার কাব্য-উপন্যাস পাঠের সঙ্গে কোন মিল নেই।'

হয়তো সেই কথাই সত্যি। অমলের সঙ্গে তাঁর মিলটা এমনি করে ক্ষয় হতে হতে শুধু একটি তিল প্রমাণে এসে ঠেকবে। অমলের অনেক চালচলনের অর্থই বিমলেন্দু আজকাল বুঝতে পারেন না। মানে ভিতর ভিতর পছন্দ করেন না। তবু বাইরের কেউ যদি তার নিন্দা করে, হঠাৎ সেই তিলটি পর্বত প্রমাণ হয়ে ওঠে। বিমলেন্দু দারুণ আঘাত পান। জয়ন্তীর জীবনের একটি ঘটনার গতি নির্ণয়ের ব্যাপারে অমলেন্দুর অনেকখানি হাত আছে বৈকি। তার একরোখা চরিত্র, এক-গুঁয়েমি, পরিবারের ওপর তার আধিপত্য—সব কিছুর চাপ ওই ঘটনার ওপর গিয়ে পড়েছে। আর বলতে গেলে অমলেন্দুকে এই ঘটনার উৎপত্তির জন্যেও দায়ী করা যায়। কারণ এত বড় কেলেঙ্কারি যাকে নিয়ে ঘটল, সেই গোবিন্দ পাল অমলেন্দুরই সবুজ সঙ্ঘ না তরুণ সঙ্ঘের এক সাঙ্ঘাতিক ছেলে। হয়তো

সেইজন্যেই সেই দোষস্খালনের জন্যেই অমলেন্দু এত কাণ্ড করেছে, এত কঠোর আর এত নির্মম হতে পেরেছে। কিন্তু সে যাই করে থাকুক, বিমলেন্দু তো একথা ভুলতে পারেন না যে সে জয়ন্তীর কল্যাণের জন্যেই করেছে। সে তার দাদার মেয়েকে আপন মেয়ের মতই ভালোবাসে।

বিমলেন্দুর উকিল বন্ধু জয়দেব এ ব্যাপারে অমলের যত নিন্দাই করুক, বিমলেন্দু তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বিনা প্রতিবাদে শুনলেও নির্বিচারে তা মেনে নিতে পারেন না। আগাগোড়া সব খুঁটে খুঁটে তলিয়ে দেখা দরকার। অমলের ঘাড়ে সব দোষ চাপাবার আগে এ সম্বন্ধে নিজের দায়িত্ব কতখানি তাও বিমলেন্দুকে বুঝে দেখতে হবে। জয়দেব তাঁকে নির্দোষ বললেই তো তিনি আর নির্দোষ হয়ে যেতে পারেন না। জয়দেব তাঁর পক্ষের উকিল। কিন্তু নিজেকে নিরপেক্ষ হতে হবে।

জয়দেব তাঁর স্ত্রী ইন্দিরাকেও দায়ী করেছে। স্ত্রীর ওপর বিমলেন্দুর যে বিশেষ আসক্তি আছে সে খোঁটা অমলেন্দুর মত জয়দেবও দেয়। তা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা শ্লেষ-ব্যঙ্গ জয়দেবও কম করে না। এদিক থেকে বিমলেন্দুর ভাই আর বন্ধু একই ধরণের। তিনি নিজে জানেন ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে কত আলাদা। তিনি নিজে ভিতরে ভিতরে অনুভব করেন আধুনিক শিক্ষিত সভ্য রুচিবান ভাবপ্রবণ সংবেদনশীল মানুষের দাম্পত্য জীবন ভিতরে ভিতরে কি জটিল। দুই অসম ব্যক্তিত্বের ঘাত-

[illegible]কে আজকাল আর শুধু বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সারা জীবনব্যাপী চলে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার মত সেগুলি চোখের অগোচরে নানাভাবে ছড়িয়ে থাকে। মোটা বাঁধনটা ঠিকই থেকে যায়। কিন্তু অনেক সুতাতন্তু ছেঁড়ে, অনেক মোহভঙ্গ হয়, রঙিন স্বপ্ন হাতুড়ির আঘাত লাগা রঙিন কাঁচের মত ভেঙে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকে। বিমলেন্দুর মনে হয়, এখনকার দিনে নারী-পুরুষের সামঞ্জস্যের সাধনাই সব চেয়ে কঠিন সাধনা।

সেই যে কিশোরী মেয়েটি বিমলেন্দুর অলক্ষ্যে এসে একদিন তাঁর টেবিল গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই ঘনকুন্তলা যে মেয়েটিকে ছায়ার মত একবার দূরে থেকে দেখে তাকে কাছে পাবার জন্যে, তার কাছে যাবার জন্যে বিমলেন্দু ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই ইন্দিরা এখন আর নেই। সে এখন স্মৃতিলোক-বাসিনী। অবশ্য দেহে মনে বিমলেন্দুও অনেক বদলেছেন। দেহের সেই কান্তি আর নেই, মনের প্রশান্তি অপসৃত। মেজাজ তাঁর বৃদ্ধ বাবার মত খিটখিটে হয়ে এসেছে। তবু নিজের পরিবর্তনটা তো আর অত সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। মনেও পড়ে না। প্রতিমুহূর্তে যদি সে মনে করত তার বয়স বাড়ছে, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে পাগল হয়ে যেত। কিন্তু বয়স তো সেভাবে আসে না। বয়স আসে পা টিপে টিপে, সইয়ে সইয়ে। এমনভাবে আসে যে মানুষ তার সব বয়সের সঙ্গেই নিজেকে অভিন্ন করে ভাবে। সব বয়সকেই সে ভালো-

বাসে। বাল্য কৈশোর যৌবন জরা নিজের কাছে কিছুই অনাদৃত থাকে না। কিন্তু সেই চোখ নিয়ে সব সময় স্বামী স্ত্রীকে দেখতে পারে না, কি স্ত্রী স্বামীকে দেখতে পারে না। বিমলেন্দুর চোখেও সেই অক্ষমতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর যৌবনের চোখ নিয়ে, যৌবনের স্বপ্ন নিয়ে, প্রৌঢ়া স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন, আহত হন, ব্যথিত হন। ইন্দিরা বড় তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। এক-একটি সন্তান আসে, আর তার অনেকখানি রূপলাবণ্য শুকনো পাতার মত ঝরে যায়। সন্তান না এলেও যেত। তবু তো ফুলের বদলে ফল লাভ হয়। কিন্তু বেশি ফল তাঁরা চাইলেন না। চারটিতেই ক্ষান্ত দিলেন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালেন ইন্দিরাকে। তবু জরা আসতে লাগল। শুধু দেহের জরা নয়, মনের জরা। চালচলনে কথায়বার্তায় তার প্রকাশ দেখতে পেয়ে বিমলেন্দু যত ব্যথিত হতে লাগলেন, ইন্দিরা তত শাড়ির রঙে, ব্লাউসের বর্ণবৈচিত্র্যে, পুরনো গয়না ভেঙে তাকে নতুন প্যাটার্ন দিয়ে নিজের দেহের সেই অপহৃত তারুণ্যকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। বিমলেন্দু একদিন বলেছিলেন, 'ওসব কেন করছ? ওসব কি আর তোমাকে মানায়?'

ইন্দিরার মুখখানা প্রথমে সাদা হয়ে গেল, তারপরে লাল টকটকে হয়ে উঠল, 'মানায় না? কেন আমি কি তোমার চেয়েও বুড়ো হয়ে গেছি?'

সঙ্গে সঙ্গে হৃতযৌবনা সমস্ত নারীর আর্তস্বর যেন বিমলেন্দুর

কানে গেল। ইন্দিরা বুড়ো না হলেও বুড়ো হতে যাচ্ছে একথা ঠিকই। কিন্তু প্রাণপণে সেকথা অস্বীকার করছে। যেন এই অস্বীকৃতির ভিতর দিয়েই জরার বিকৃতিকে সে ঠেকিয়ে রাখবে। এই ব্যর্থ প্রয়াসে তো নারী-পুরুষের কোন ভেদ নেই। পুরুষও চুলে কলপ লাগায়, বয়েস ভাঁড়ায়, মিহি ধুতি পাঞ্জাবি পরে, জুতোয় ঘনঘন পালিশ লাগায়, সেও তারুণ্যের শেষ দীপ্তিকে ধরে রাখতে চায়। হঠাৎ স্ত্রীর ওপর সহানুভূতি অনুভব করলেন বিমলেন্দু। তিনি ভাবলেন, আমরা সব বয়সকে ভালোবাসি একথা ভুল। জরাকে বাধ্য হয়ে ভালোবাসি, যৌবনকে মুগ্ধ হয়ে ভালোবাসি। ইন্দিরা গভীর অভিমানে বলল, 'তোমার চেয়ে তো আর বুড়ো হইনি। তোমার চেয়ে অন্তত আট-ন বছরের ছোট আমি। তোমার যদি ভালো না লাগে আমার দিকে তাকিও না। আমি আমার জন্যে পরি, আর কারো ভালো লাগবে বলে তো পরিনে। আর কদিনই বা পরব? তোমার কি। তুমি বয়সে বড় হয়েও ছোট সেজে অনেককাল ঘুরে বেড়াতে পারবে। কিন্তু আমি তো আর তা পারব না।'

নিজের দম্ভকে নিজেই চূর্ণ করে দিল ইন্দিরা। নিজেই হার মানল। বয়েসকে প্রতিরোধের প্রতিযোগিতায় পুরুষের কাছে নারী হেরে যায়। জরা-আক্রান্ত হলেও আসলে পুরুষ। দৈত্যের মত রাহুর মত সেও নারীর দিকেই আগে থাবা বাড়ায়।

স্ত্রীর সাজসজ্জা নিয়ে আর কোন কথা বললেন না বিমলেন্দু। কিন্তু স্ত্রীর রুচির স্থূলতা তাঁর চোখকে পীড়িত আর মনকে

নিপীড়িত করতে লাগল। এমনি প্রত্যেক ব্যাপারে। যে পীড়া তিনি অন্যকে দিতে পারেন না, তা তিনি নিজে মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করেন। আর তার ফলে তাঁর ভিতরের আর্তিতা তাঁর কথায় আর চালচলনে ধরা পড়ে। তাঁর অসন্তুষ্টি বাড়ে, তাঁর মেজাজ খিটখিটে হয়। তিনি সব বোঝেন। নিজের নাড়ী ধরে তিনি মনের সব রোগ টের পান। কিন্তু রোগ চেনা আর তার চিকিৎসা করা তো এক ব্যাপার নয়। চিকিৎসার সাধ্য তাঁর নেই। শোধরাবার সাধ্য তাঁর নেই। না নিজেকে না অন্যকে।

কিন্তু শুধু রূপ-যৌবন-সাজসজ্জা নিয়েই নয়, শুধু বহিরঙ্গের ব্যাপারেই নয়, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আরো প্রভেদ আরো বৈষম্য ভিতরে ভিতরেও বাড়তে থাকে। একান্নবর্তী পরিবারে গুরুজন, প্রিয়জনের সঙ্গে আচার-আচরণে ব্যবহারে-ভাষণে যে উদারতা আর শোভনতা তিনি স্ত্রীর কাছে আশা করেন তাতে যথেষ্ট ঘাটতি পড়ে। তিনি ভাবেন মেয়েরা কি এক সৃষ্টিছাড়া জীব? তারা কোন যুক্তির ধার ধারে না, সামঞ্জস্য তাদের স্বভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। তারা এক-একটি বিপুল আবেগের স্তূপ। সে আবেগ কখনো বারুদ হয়ে ফেটে পড়ে, কখনো চোখের জলের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যায়। তা কখনো মরুভূমির মত রিক্ততায় খাঁ খাঁ করে, রুদ্রতায় ঝাঁ ঝাঁ করে, আবার কখনো শ্যাম-শস্যসম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইজন্যেই কি পুরুষ নারীকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করেছে, প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছে?

নিয়মের পৃথিবী, নিয়মের প্রকৃতি আর কতটুকু? তার উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলতা আর অসৌন্দর্যের কাছে তার সুষমা বিন্দুবৎ। আর সেই সিন্দুর বিন্দুতেই পুরুষ আত্মতৃপ্ত। ভাবে সব জয় করেছি, বশ করেছি, শাঁখা-চুড়ি পরিয়ে চির-সৌন্দর্যের বাঁধনে বেঁধেছি, শাড়ি পরিয়ে সব নগ্নতাকে ঢেকেছি। কিন্তু তা হয় না। যখন ভুল ধরা পড়ে, তখন নারী-বিলাসী পুরুষই নারী-বিদ্বেষী হয়ে গাল পাড়তে থাকে। তখন সেই পুরুষই বলে, নারী হল বর্বর আর কচ্ছপের জাত। অশিক্ষা, অসংস্কৃতি, অসভ্যতার শেষ ঘাঁটি। এ ঘাঁটি জয় করতে সভ্যতার আরো হাজার হাজার বছর কেটে যাবে। বিমলেন্দু পরমুহূর্তে ভাবেন, একথা কি কেবল বিশ্বপ্রকৃতি কি নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধেই সত্য? নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের অন্তর্প্রকৃতি সম্বন্ধেও কি ওই একই ভাষা, একই বিশেষণ প্রয়োগযোগ্য নয়? নারীর কাছে পুরুষই কি সব সময় প্রেমিক, প্রণয়ী, কবি, শিল্পী, প্রিয়ংবদ সত্যদ্রষ্টা ঋষি? এমন বহু মুহূর্ত আসে যখন তাকেও বর্বর আর কচ্ছপের সঙ্গে মেয়েরা মনে মনে তুলনা দেয়। পুরুষকে নৃশংস ঘাতক বলেই তাদের মনে হয় তখন। মনু যদি মানবী হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই শ্লোকগুলি উল্টো করে লিখতেন। আসলে সামঞ্জস্যের অভাব পুরুষেরও আছে, নারীরও আছে। সামঞ্জস্যের সাধনা নারী-পুরুষ প্রত্যেকের একক সাধনা, আবার যুগ্ম সাধনা। বিমলেন্দু ভাবেন হয়তো দোষ তাঁরই। একক অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি যতখানি সজাগ, যুগ্ম সাধনার ক্ষেত্রে তিনি

ততখানিই উদাসীন। সেতারের তার তিনি ভালো করে বাঁধতে পারেন নি। তাই তা এমন করে বারবার বেসুরো বাজে, কখনো বা বাজেই না।

স্ত্রীকে তিরস্কার করবার পর আত্মনিন্দা শুরু করেন বিমলেন্দু। দোষ তো ওর একার নয়। তিনি নিজেও দোষী, নিজেও দায়ী। তিনি বয়সে বড়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে বড় বলে তাঁর দায়িত্ব আরো বেশি। হঠাৎ পরম উদার হয়ে বিমলেন্দু স্ত্রীর সব দোষ মনে মনে নিজের ঘাড়ে নেন। পারেন তো যীশুখৃষ্টের মত পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের সব সাপ, সব দোষ বহন করবার জন্যে মাথা এগিয়ে দেন। কিন্তু এই উদারতা এই বিবেচনাবোধ তো সর্বক্ষণের জন্যে থাকে না। বিশেষ করে যখন বাপ-মা ভাই-বোনদের কটু সমালোচনা কানে যায়, তাঁর প্রশ্রয়ে, তাঁর শৈথিল্যেই ইন্দিরা অমন রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে, তখন তিনি পারেন তো সব দায়িত্ব ত্যাগ করেন, সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তখন ভাবেন ইন্দিরার তো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বিদ্যা বেশি না থাক, সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা তো আছে, সেই বিবেচনা দিয়ে কেন সে নিজেকে শোধিত সংস্কৃত করতে পারে না? তার মধ্যে মাঝে মাঝে যে উদারতা, কোমলতা, হৃদয়বত্তার পরিচয় মেলে, তা কেন স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয় না, বুদ্ধির প্রভায় দীপ্ত হয় না? কেন তার ক্রোধের ভাষা সমস্ত শালীনতা হারায়, শ্রাব্যতা হারায়, বিষাক্ত, তিক্ত আর কদর্য হয়ে ওঠে? সেইসব মুহূর্তে বর্বরা ছাড়া তাকে কেন আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে না? ক্লান্ত হয়ে কখনও কখনও চোখ

বুজে থাকেন বিমলেন্দু, মুখ বুজে থাকেন কিংবা পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতির পথ খোঁজেন। পরিচিত তরুণী মেয়েদের মধ্যে সেই হারানো সুষমা, হারানো সৌন্দর্যকে দেখতে চান। তৃষ্ণা স্থায়ী সৌন্দর্যের। তাকে পাওয়া যায় না, তাকে সৃষ্টি করতে হয়, তাকে গড়ে নিতে হয়। মাটি পাথর দিয়েই গড়ো আর শব্দ দিয়ে সুর দিয়েই গড়ো, কবি হয়েই গড়ো, কি শিক্ষক-সংস্কারক হয়েই গড়ো তাকে তোমায় গড়ে নিতে হবে। সৌন্দর্যের স্রষ্টা হয়ে সেই সৃষ্টিকে ভোগ করতে হবে। আর সব সৌন্দর্য অস্থায়ী ইলিউসন মাত্র। তবু মানুষ তো আর সব সময় স্রষ্টা নয়, সব সময় সত্যদ্রষ্টা নয়। সত্যের বদলে সে হিরন্ময় আধারের রূপে ভোলে, পূর্ণশশীর পরিবর্তে ক্ষণস্থায়ী বাঁকানো সাতরঙা রাম-ধনুর রঙে নিজের চোখ আর পৃথিবীকে রঞ্জিত করে। তাই এই রঙ-লাগা আর রঙ-মোছার লীলা তার সারাজীবন ধরে চলে। ইন্দিরা খোঁটা দেয়, 'তোমাকেও চিনি। চিনি তোমার চোখকে। তুমি যে কী দেখতে যাও, কী দেখতে চাও তা আমার বুঝতে বাকি নেই। আমাকে কেনই বা আর তোমার ভালো লাগবে ?'

কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্কের এই জোয়ার ভাঁটা, এই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম মান-অভিমানের কথা অবশ্য জয়দেব উল্লেখ করেনি। ইন্দিরার নিন্দা করার সময় পারিবারিক ঝগড়া-ঝাঁটির প্রসঙ্গও নিশ্চয়ই সে তুলতে চায়নি। জয়ন্তীর ব্যাপার নিয়ে বিমলেন্দুর স্ত্রী যে জেদ আর অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, জয়দেবের

আক্রমণের লক্ষ্য ইন্দিরার সেই আচরণ আর মেয়ের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও, দায়রা জজের রায়ের নির্দেশের নিগূঢ় অর্থ অগ্রাহ্য করেও, জয়ন্তীকে একটি ভালো ভদ্র উচ্চশিক্ষিত ছেলের হাতে সমর্পণ করবার গোপন অভিলাষ। তাই ইন্দিরাকে বিচার করতে হবে বিমলেন্দুর স্ত্রী হিসাবে নয়, জয়ন্তীর মা হিসাবে।

মীর্জাপুরের মেস ছেড়ে বিমলেন্দু দ্বিতীয় দফায় এসে যখন টালিগঞ্জে বাসা করেন তখনই জয়ন্তী তার মার পেটে। তার আগে জ্যোৎস্না হয়েছে। তিন বছর তার বয়স। মেসে দুই ভাইয়ের বেশি খরচ হয়ে যায়, অমলের স্বাস্থ্যও ভালো টেঁকে না, কলকাতায় একটা স্থায়ী বাসা করা দরকার, মা এবার সেটা অনুভব করলেন। তিনি নিজেই বারবার বলতে লাগলেন, 'একটা বাসা এবার তোমরা করো বাপু।'

বিমলেন্দুর বাবা কুলদাকান্তকে বছরে দু-একবার স্কুলের বই কেনবার জন্যে কলকাতায় আসতে হয়। প্রত্যেক বারই কি আর আত্মীয়-কুটুম্বের বাসায় ওঠা ভালো? তাছাড়া বিমলেন্দুর মারও তো মনে সাধ-আহ্লাদ আছে, কলকাতায় এসে কালীঘাটে যাবেন, গঙ্গাস্নান করবেন, পূজো দেবেন, বেলুড়-দক্ষিণেশ্বরে বেড়াবেন। কলকাতায় বাসা না থাকালে তাঁর এসব সাধ পূর্ণ হয় না। তারপর কলকাতায় একবার এসে পড়তে পারলে এখান থেকে পুরী আর গয়া কাশী এই ত্রিতীর্থ দর্শন বেশি কষ্টসাধ্য নয়। সুতরাং কলকাতায় একটা বাসা না থাকার কোন মানে

হয় না। তা ছাড়া বিমলেন্দুকে ডেকে তিনি গোপনে আরো বললেন, 'অমু বিয়ে-টিয়ে করবে না বলছে। বউমাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করলে ওকে বিয়ের জন্যে আরো চাপ দিতে পারব। বলব এই বুড়ো বয়সে আমি আর এত কষ্ট করে রান্নাবান্না করতে পারিনে বাপু। টুনুরুনু শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। তোমার বুড়ো বাপের সেবা-শুশ্রূষাই বা কে করবে? ওকে চাপ দিতে সুবিধে হবে বুঝলি?'

চাপ দিয়ে যে বিশেষ কোন সুবিধে হবে না তা বিমলেন্দু জানতেন। তবু বাসা করা যে দরকার সে কথা স্বীকার করলেন। আগের বার বউবাজারে দুখানা ঘর নিয়ে বাসা করেছিলেন। সে বাসা ছিল শুধু দুজনের জন্যে। কিন্তু এবার দু'ভাই মিলে একটা গোটা বাড়িই নিয়ে নিলেন। মা-বাবা মাঝে মাঝে আসবেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হল, পতি-পুত্র নিয়ে কোন কোন সময় বোনেরা আসবে, তারপর অমলকে যদি ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়াই যায়, তার জন্যেও একখানা ঘরের দরকার হবে। সবদিকে চোখ রেখে ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাসা করলেন বিমলেন্দু। তখনও যুদ্ধ লাগেনি। বাড়ি ভাড়া এখনকার তুলনায় অনেক সস্তা। ওপরে-নিচে চারখানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, ভাঁড়ারের ব্যবস্থা আছে। ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ টাকা। একটু পুরনো ধরণের বাড়ি, তা হোক, বাড়ির ভিতরে অনেক জায়গা। ভিতরে উঠোন, দোতলার ওপরে উঠোনের মতই একখানা বিরাট ছাদ। ঘনবসতি না হয়ে জায়গাটা খানিক

বাইরের দিকে বলে অমল প্রথমে একটু খুঁত খুঁত করেছিল, কিন্তু বিমলেন্দু বললেন, 'এই ভালো, বেশ ফাঁকা, খোলা-মেলা আছে।'

এখন অবশ্য আর ফাঁকা নেই। এখন শহরের এই দক্ষিণ প্রান্তেও লোক গিজগিজ করছে। আশেপাশে অনেক নতুন বাড়ি উঠেছে। অনেক পুরনো বাড়ি ছেড়ে ভিন্নপাড়ায় নতুন বাড়িতে উঠে যাবার কথা হয়েছে বিমলেন্দুদের। কতবার বাড়ি বদলাবার জন্যে ইন্দিরা আর অমল আদা-নুন খেয়ে লেগেছে। কিন্তু বাড়ি আর শেষ পর্যন্ত বদলানো হয়নি। সবাই বিমলেন্দুকে বাড়ি বদলাবার ব্যাপারে রক্ষণশীল বলে ঠাট্টা করলেও, ভাড়া আর সুবিধা-সুযোগের অনুপাতে কোন বাড়িই ওদের মনঃপূত হয়নি। শেষের দিকে চেষ্টাও তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। আর তার ফলে এই একই জায়গায় একই বাড়ির মধ্যে পুরো যৌবন-কালটা কেটে গেছে। বিমলেন্দুর। ভাবলে এখন তাঁরই বিস্ময় বোধ হয়। কি করে এতগুলি বছর কাটালেন? কোন হিসাব নেই, হিসাব থাকবে না কেন? সংসারের জমাখরচের খাতায় হিসাব অবশ্যই আছে। জ্যোৎস্না-জয়ন্তী হয়েছে। তারপরের পাঁচ বছরের মধ্যে আরো দুটি নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর এসেছে শম্ভু-রঞ্জু, দুই ছেলে। মা বলেন, ওরা আগের দিকে জন্মালে এতদিনে প্রায় ছেলের রোজগার খাওয়ার সময় হত। কিন্তু তার কপাল মন্দ। তার মেয়ে দুটোই আগে এল। জ্যোৎস্না নামেই জ্যোৎস্না। ওর রং ময়লা, গড়নও তেমন ভালো নয়।

কিন্তু ওর পিঠে পিঠে জয়ন্তী আবার সবারই চোখ জুড়োল। ওর গায়ের রং চিকন গৌর, নাক-চোখ সুন্দর। গড়নও বেশ দীর্ঘ। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার প্রত্যেকের আদরও কেড়ে নিল। আর অমল তো ওকে মাথার মণি করে তুলল। জয়ন্তী কাকার সঙ্গে খাবে, কাকার সঙ্গে ঘুমোবে। দিদিকে কিছুতেই কাকার কাছে ঘেঁষতে দেবে না। কাকা যেন ওর একারই।

ইন্দিরা হেসে বলত, 'ঠকুরপো, এমন পক্ষপাতও ভালো নয়। আমার বড় মেয়ে না হয় একটু কালোই আছে, তাই বলে তুমি ওকে একটু ছুঁয়েও দেখবে না?'

অমল বলত, 'কালো মেয়েকে আমি ছুঁইনে। ওকে সাবান-টাবান দিয়ে পরিষ্কার করে আনো, তারপরে নেব।'

একথা শুনে খুকির মুখ ভার হত। ঠোঁঠ ফুলত, চোখ দুটি ছল ছল করে উঠত। তারপর অমলই অবশ্য হেসে ওর গাল দুটি টিপে দিয়ে নিজের কোলে টেনে নিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীও ঝাঁপিয়ে পড়ত কাকার কোলে। অমল দু'জনকেই কোলে নিয়ে বলত, 'এবার তোরা মনের সাধে ঝগড়া কর আমি দেখি। একজন আর একজনকে কামড়াও আঁচড়াও, যা খুশি তাই কর। কেউ কিছু বলবে না। রণাঙ্গনে দুই বীরাঙ্গনা, চালাও যুদ্ধ, চালাও।'

ইন্দিরা বলত, 'থাক ঠাকুরপো, ওদের মারামারি করতে তোমাকে আর শিখিয়ে দিতে হবে না। তুমি তো বাড়ি থাক না। যত হাঙ্গামা আমাকেই পোহাতে হয়। রাতদিন কেবল

খিটখিট করবে। আমি আর পারিনে। মা বলেন, দুই সতীনের ঝগড়া, লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ।'

অমল বলত, 'দাঁড়াও, এখনই হয়েছে কি, কার্তিক গণেশেরা আসুক, মাথার চুল টেনে ছিঁড়বে।'

ইন্দিরা লজ্জিত হয়ে বলত, 'থাক থাক ও আশীর্বাদ আর কোর না। যথেষ্ট হয়েছে।'

বিমলেন্দু ওদের বেশি কাছে ঘেঁষতেন না। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, মা আর কাকার আদর ওরা এত বেশি পেত যে বাপের আদরের আর দরকার হত না। গুরুজনদের সামনে ওদের আদর করতে তখন বিমলেন্দুরই বরং লজ্জা হ'ত।

ইন্দিরা মাঝে মাঝে অভিমান করে বলত, 'তুমি আমার মেয়েদের দেখতে পার না। ওরা তো ছেলে হয়ে জন্মায়নি, সেইজন্যে তোমার রাগ।'

বিমলেন্দু বলতেন, 'তা না, আসলে মেয়েদের মাকে নিয়েই আমাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্যদিকে তাকাবার ফুরসৎ কই।'

ইন্দিরা লজ্জিত হয়ে বলত, 'আহা, কত ব্যস্ত যেন থাক। আমার সব জানা আছে। সব কেবল তোমার ওই মুখে। আসলে তুমি কাউকেই ভালোবাস না, না আমাকে না সংসারকে। তুমি শুধু ভালোবাস নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকতে।'

স্ত্রীর এই খোঁটা মনে মনে উপভোগ করতেন বিমলেন্দু। নিজের মধ্যে নিজে তলিয়ে যাওয়ার মত আনন্দ আর নেই। কিন্তু সে ভাবে তলাতে হলে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ব্যাপ্তিতে উপলব্ধি আর অনুভব শক্তির অনুশীলনে, নিজেকে তলাবার মত গভীর করে তুলতে হয়। না হলে ডুব দেওয়ার মত জল পায় কোথায় মন? ব্যক্তিত্বের সেই অনুশীলন সহজ-সাধ্য নয়। তবু তিনি যে সংসারে থেকেও অনেকখানি নির্লিপ্ত এ কথা সবাই বলত। তিনিও ভাবতেন, ছেলেমেয়েদের ওপর তাঁর বোধ হয় মায়ামমতা তেমন হবে না। সন্তান হলেও তিনি অতি বাৎসল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙ্গতে বেশি দেরি হ'ল না। যত নিজের বয়েস বাড়তে লাগল, মেয়েরা বড় হতে লাগল, বিমলেন্দুর বাৎসল্যও তত উদ্রিক্ত হতে শুরু করল। মেয়েদের সামান্য একটু অসুখ-বিসুখে তিনি উদ্বিগ্ন হন, স্কুল থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে তিনি অধীর হয়ে ওঠেন। মেয়েদের পড়াশুনো সম্বন্ধে ক্লাস-টিচার কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য লিখলে তাঁর রাগ হয়, তারা পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে তিনি ব্যক্তিগত অপমান বোধ করেন। চটে গিয়ে স্ত্রীকে বকেন, মেয়েদের বকেন, তাদের প্রাইভেট-টিউটরকেও কিছু দোষারোপ না করে ছাড়েন না। ভাইকে বকেন, 'তুই তো কেবল তোর দেশোদ্ধার নিয়েই আছিস, ওদের পড়াশুনোর দিকে কি তোর কোন লক্ষ্য আছে?' তারপর নিজেই নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হন। ছি-ছি-ছি,

অমলকে ওভাবে ধমকানো তাঁর উচিত হয়নি। সত্যিই তো, সারাদিনের মধ্যে ওর সময় কই, ও যতখানি করে তাই যথেষ্ট। কোন-কোনদিন নিজেই মেয়েদের ডেকে নিয়ে পড়াতে বসেন। কিন্তু ওরা পরপর দু-দিন যদি আসে তৃতীয় দিনে আর কিছুতেই আসতে চায় না।

ইন্দিরা হেসে বলে, 'থাক, আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। তুমি তোমার নিজের কাজকর্ম কর। খুকি কি জয়ন্তী কেউ তোমার কাছে পড়তে চায় না। তুমি মাস্টারি করলে দুদিনের বেশি কোন স্কুলে টিঁকতে পারতে না। জয়ন্তী তো পরিষ্কারই বলে বাবা সোজা ব্যাপারটাকে কঠিন করে দেয়। কি যে আবোল-তাবোল বকে মা, কিচ্ছু বোঝা যায় না।'

স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক মন খুলে হাসতে পারেন না বিমলেন্দু। একটা সূক্ষ্ম কাঁটা ছুঁচের মত কোথায় গিয়ে যেন বেঁধে। তাকে তুলে ফেলা শক্ত হয়।

কিন্তু নিজের মেয়ের কাছে মাস্টার হিসাবে বিমলেন্দু নিজেই শুধু বাতিল হন না, অমন যে জাত-মাস্টার তাঁর বাবা, তাঁকে পর্যন্ত জয়ন্তী বাতিল করে দেয়। ইন্দিরা যদি বলে, 'তুই তোর দাদুর কাছে পড় গিয়ে না খানিকক্ষণ।'

জয়ন্তী বলে, 'দাদু আবার পড়াতে পারে নাকি!'

ইন্দিরা বলে, 'তুই অবাক করলি জয়ন্তী! জানিস, উনি কতদিনের পুরনো মাস্টার?'

জয়ন্তী বলে, 'জানি। ছাত্রেরা ওঁকে নাকি একবার খুব—।'

জয়ন্তী হাসতে থাকে।

বিমলেন্দু বইয়ের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকান, আর ছোট মেয়ের এই বাচালতা শোনেন। বয়সে ছোট হলেও দেখতে আর তেমন ছোট নেই জয়ন্তী। বাড়-বাড়ন্ত গড়ন ওর। এগার উৎরে বারোয় পড়েছে। কিন্তু এখনই যেন ফ্রক ছাড়িয়ে শাড়ি ধরাতে পারলে ভালো হয়। আর মুখে যত পাকা পাকা কথা। এত পাকা কথা ও কোত্থেকে শিখল? মাঝে মাঝে স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসা করেন বিমলেন্দু, 'এসব ও পায় কোত্থেকে?'

ইন্দিরা বলে, 'কোত্থেকে আবার পাবে? পায় ওর ঠাকুরমার কাছে। তুমি তো জানো না তোমার ছোট মেয়ের কাণ্ড। ও তোমার মা সেজে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে। আমার ক্যারিকেচার করতেও ছাড়ে না। ভারি পাজী হয়েছে।'

কিন্তু পাজীই হোক আর যাই হোক, জয়ন্তী তার উচ্ছলতা, প্রগলভতা আর দুরন্তপনায় সবাইএর হৃদয় জয় করেছে। জ্যোৎস্না বড় শান্ত, নিরীহ, গম্ভীর। বিমলেন্দু ভাবেন এই, মেয়েই ঠিক তাঁর স্বভাব পেয়েছে। পাছে নিজেকে ও অনাদৃত মনে করে, তাই জ্যোৎস্নাকেই তিনি বেশি কাছে ডাকেন, আদর করেন গল্পের বই টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে এনে বড় মেয়ের হাতে দেন। বলেন, 'তুমি নিজে ওকে ভাগ করে দেবে।' কিন্তু ভিতরে ভিতরে গোপন চাপা আকর্ষণ তিনি তাঁর ছোট মেয়ের ওপরই অনুভব করেন।

বিমলেন্দুর বাবা মাঝে মাঝে ডাকেন, 'এসো দিদিমণিরা, আমার কাছে পড়বে এসো।'

জ্যোৎস্না শান্তভাবে দাদুর কাছে বইপত্র নিয়ে বসে। জয়ন্তীও বইখাতা নিয়ে যায় বটে, কিন্তু মোটেই পড়তে চায় না। ওর কেবল দুষ্টুমি।

বাংলা থেকে ইংরেজীতে ট্রানস্লেসন করতে করতে হঠাৎ খাতা থেকে মুখ তুলে বলে, 'আচ্ছা দাদু, তোমার সেই মার খাওয়ার গল্পটা আবার বল না।' বিমলেন্দু জানলা দিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকান। না—তাঁর বাবা এখন আর সে কথায় রাগ করেন না, হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন, তোমার ঠাকুরমার কাছে শুনতে শুনতে সে গল্প তো তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে দিদিমণি, আর কেন!'

জয়ন্তী ওর সুন্দর সাদা ধবধবে দাঁতগুলি বের করে অপরূপ ভঙ্গিতে হাসে, বলে, 'দাদু, ওগল্প তোমার মুখ থেকে শুনতে আরও বেশি মজা লাগে। জানো দাদু, তুমি যদি এবার আমাদের মেয়েদের স্কুলে মাস্টারি করতে আস, আর ফের যদি অমন কড়াক্কড়ি কর, তুমি আমাদের ছাত্রীদের হাতেও মার খাবে।'

বিমলেন্দুর বাবা হাসেন, 'সে তো আমার পক্ষে পুষ্পবৃষ্টি হবে দিদিমণি।'

জয়ন্তী বলে, 'ইস পুষ্পবৃষ্টি! কি রকম পুষ্পবৃষ্টি একবার দেখ তো?'

খাতা ফেলে উঠে গিয়ে জয়ন্তী বিমলেন্দুর বাবার পিঠে

ছোট্ট একটি কিল বসিয়ে দেয়। জয়ন্তীর দাদু কিল খেয়ে কিল চুরি করেন না। তাঁর সেই অভিনয়স্পৃহা আবার জেগে ওঠে। আর্তস্বরে চীৎকার করে বলেন, গেলাম গেলাম বউমা, তোমার ছোট মেয়ে আমাকে খুন করে ফেলল।'

জয়ন্তী দাদুর পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে এক হাতে তাঁর মুখ চেপে ধরে হাসতে হাসতে বলে, 'চুপ চুপ, যারা গুম খুন হয়, তারা অমন করে চেঁচাতে পারে না। মোটেই চেঁচিও না দাদু। নিঃশব্দে খুন হয়ে যাও।'

এক রাশ চুল হয়েছে মেয়েটার মাথায়। ওর কালো মসৃণ চুলগুলিতে বিমলেন্দুর বাবার মাথা মুখ ঢেকে যায়। সত্যিই তিনি আর কথা বলতে পারেন না। বিমলেন্দু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আর হাসেন। তাঁর মত আত্মমগ্ন মানুষও সব সময় নিজের মধ্যে তলিয়ে থাকতে পারেন না। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠেন। বাইরের এই বিচিত্র বিশ্বরূপের দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিজের মেয়ের কাণ্ড দেখতে দেখতে প্রসন্ন মনে হাসেন আর ভাবেন—তাঁর এই মেয়েকে কে না ভালোবাসে, কে না ভালো-বাসবে?

অবশ্য এই প্রসন্নতা সব সময় থাকে না। জীবন-দেবতার প্রসাদ তিনি তো পুরোপুরি পাননি। কেই বা পায়? বাইরে থেকে দেখলে যাঁর ধন-দৌলতের সীমা দেখা যায় না, হয়তো একটু ভিতরে খোঁজ নিলে দেখা যায়, তাঁর মনেও অশান্তি, তাঁর অন্তরও শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে। হয়তো পারিবারিক জীবনের

মাধুর্য থেকে তিনি বঞ্চিত, স্বজন-বন্ধুর প্রীতি আর বিশ্বাস হয়তো হারিয়েছেন, হয়তো অন্য কোন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার চাপে নিত্য পীড়িত হচ্ছেন।

বিমলেন্দুকে অভ্যন্তরীণ সংঘাত সংঘর্ষ ছাড়াও নানা বাইরের পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। চাকরির স্থলে তাঁর সুখ হয়নি। স্কুল-পালানো ছেলের মত তিনি কেবলই কর্মস্থল থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। কোন কালেই তাঁর মন বসেনি, কোন কাজই তাঁর মনঃপূত হয়নি। এ পর্যন্ত কত অফিসের অন্নই না খেলেন। কিন্তু কোনটাই বেশিদিন হজম করতে পারলেন না। পাবলিসিটি, ইনসিওরেন্স, স্টেশনারি স্টোর্স অনেক ঘাট ঘুরে শেষ পর্যন্ত ঢুকেছেন ওই কলেজ স্ট্রীটের পাবলিশিং ফার্মে। ফর্মায় ফর্মায় পাঠ্য বই লেখা, লেখানো, সম্পাদনা, প্রুফ দেখা—এখন এই তাঁর কাজ। কিন্তু এ কাজও তাঁর ভালো লাগে না। নানা ভুলচুক হয়। মনিবের সঙ্গে কথান্তর মতান্তর ঘটে। ইন্দিরা বলে, 'খবরদার, এ চাকরি গেলে বুড়ো বয়সে আর চাকরি জুটবে না। ফের যদি বেকার হও, সব শুদ্ধ না খেয়ে মরতে হবে। সে কথা মনে রেখো।' এদিক থেকে অমলেন্দু বড় সুখী। সে দেশের কাজ করুক আর যাই করুক, নিজের কাজটুকু বেশ গুছিয়ে করতে জানে। সেই একই অফিসে শুধু যে টিঁকে আছে তাই নয়, রীতিমত প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি নিয়ে আছে। এমন কি অফিস ইউনিয়নের সঙ্গে

তার যোগাযোগ আছে জেনেও সাহেবরা তাকে হটাতে পারেন না, ঘাঁটাতে চান না। অমলেন্দু পদস্থ ব্যক্তি। অফিসার গ্রেডে উঠেও সহকর্মী কেরানীদের সে ভুলে যায়নি। যেমন অফিসে তেমনি বাড়িতে অনেকেই তার উপর নির্ভর করে। বিমলেন্দুর মত সে পদে পদে অপদস্থ হয় না।

নিজেকে বড়ই অকৃতার্থ ভাবেন বিমলেন্দু। মনে করেন, সবাই বুঝি তাকে তুচ্ছ করে। অফিসের কারোর সঙ্গে মেশেন না। কাজটুকু সেরে নিজের ঘরে বসে বই পড়েন। আর মাঝে মাঝে নিজের পরিবারের ছোট ছোট দৃশ্য কি ঘটনা থেকে মধু আহরণের চেষ্টা করেন। এই কর্মময় জগতে কর্মবীর না হোক, মোটামুটি ধরণের কাজের মানুষ না হতে পারার দুঃখ কি কম। তিনি ভাবেন, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি যেটুকু আছে, সেটুকু দান করে তিনি শিক্ষক হতে পারতেন কিন্তু তিনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারতেন না, এই ভয়ে পৈতৃক বৃত্তির ধার দিয়ে গেলেন না। তাছাড়া মাস্টারির ওপর তাঁর একটা বিতৃষ্ণাও ছিল। চিত্ত-বৃত্তিতে বাবার সঙ্গে তার মিল নেই, বৃত্তিতেই বা কেন থাকবে? হয়তো লেখক হতে পারতেন। তাঁর চিঠিপত্র দেখে অনেক বন্ধু প্রশংসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে লেখকও যে দু-একজন না আছেন তা নয়। যৌবনে লেখা তাঁর ডায়েরির কিছু কিছু অংশ যাঁদের পড়ে শুনিয়েছেন তাঁরাও সুখ্যাতি করেছেন। বলেছেন, 'বেশ হয়েছে, তুমি ছাপতে দাও। এ জিনিস পাঠকদের ভালো লাগবে।' কিন্তু কেমন একটা অদ্ভুত সংকোচে তিনি পিছিয়ে

এসেছেন। বিশ্বসাহিত্যে এত ভালো ভালো লেখা আছে। সেই রত্নরাজির তুলনায় তাঁর লেখা কিছুই না। অথচ তাঁরই মত নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর লেখা লিখে আর তা অসংকোচে অনবরত ছেপে বের করে কত লোক বিখ্যাত হয়ে গেল। বিমলেন্দু ভাবেন চক্ষুলজ্জা না ছাড়লে লেখক হওয়া যায় না, নিজের সম্বন্ধে নির্বিচার আত্মপ্রত্যয় না থাকলে লেখক হওয়া সম্ভব না। অভিনেতা হতে গেলে যেমন গায়ে মুখে পেইন্ট করতে হয়, বিমলেন্দু ভাবেন, লেখক হতে গেলেও খানিকটা লোকলজ্জা ছাড়তে হয়, পরিচিত বন্ধুদের নিন্দা আর পরিহাসের ভয় থেকে মুক্ত হতে হয়। খানিকটা অভিনয়ও শিখতে হয় হয়তো। নিজের সঙ্গে নিজের অভিনয়—পরের সঙ্গে নিজের অভিনয়। মিথ্যাচারী না হলে অত মিথ্যা কথা লেখকরা লেখেন কি করে? মিথ্যাচারী বৈকি। তাঁদের মনের সঙ্গে তাঁদের বাক্যের মিল কতক্ষণ? যতক্ষণ লেখেন ততক্ষণ। না হলে নিজেদের লেখার সঙ্গে তাঁদের জীবনের আর কোন মিল নেই। তাঁদের বাক্যে যে সত্যের আভাস দেখা যায়, তাঁদের আচার-আচরণে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষক হতে হতে বিমলেন্দু শিক্ষক হলেন না। কিন্তু প্রাইভেট টুইশনের হাত থেকে কি রক্ষা পেলেন? লেখক হতে হতে বিমলেন্দু লেখক হলেন না, কিন্তু বিনা নামে পাঠ্য বইয়ের বোধিনী লেখার হাত থেকে কি রক্ষা পেলেন? সারাজীবন বিমলেন্দু নিজের পছন্দ মত কাজ খুঁজে পেলেন না। যে সব কাজ পেলেন, তা এমন

ভাবে যাতে অন্যেও ছিছি করল, নিজেও নিজেকে ধিক্কার দিলেন।

দু-একজন স্বজন বন্ধুর কাছ থেকে আর নিজের পারিবারিক জীবন থেকে রস আহরণের চেষ্টা করলেন বিমলেন্দু। বাবা-মা নেপথ্য লোকে সরে গেছেন, ভাই তার নিজের কাজে ব্যস্ত, মিল আর অমিলে মেশানো স্ত্রীর সঙ্গে অদ্ভুত এক জটিল সম্বন্ধ। ছেলেমেয়েদের কাছেও তিনি ধরা দিতে পারলেন না, কিংবা তাদের জড়িয়ে ধরতেও পারলেন না। শুধু একটু দূরে থেকে তাদের দেখতে লাগলেন আর তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। তাঁর সংসার রঙ্গমঞ্চে তিনি যেন অভিনেতা নন, দর্শক। কখনো কখনো মনে হয়, এ তাঁর নিজের লেখা নাটক, কখনো কখনো মনে হয়, অন্যের লেখা হলেও তাতে রসের স্পর্শ আছে।

দুটি ছেলে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। বই খাতা নিয়ে তারা পাড়ার স্কুলে যায়। দেখতে ভালোই লাগে। ওদের দেখে অনেক দূরে ফেলে আসা নিজের শৈশব-বাল্যের কথা মনে পড়ে বিমলেন্দুর। মনে পড়ে তাঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যেও অমনি অবিচ্ছিন্ন গলাগলি ভাব ছিল। আর নিজের দুই মেয়েকে দেখে টুনু-রুনুর কথা বিমলেন্দুর মনে পড়ে যায়। তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বোধ হয় আর একটু ঘনিষ্ঠ ছিল। তারা তাদের আর একটু বেশি বুঝত, বেশি কাছে আসত। কারণ সেই বয়সে বিমলেন্দু এমন প্রবীণ আর আত্মকেন্দ্রিক হননি। ওরা অনেক দূরে আছে। একজন ডিব্রুগড়ে, আর একজন

দিল্লীতে, ভাগ্য ভালো। দুই ভগ্নিপতিই মোটামুটি ভালো চাকরি করে। নিজের দুই মেয়ের মধ্যে কৈশোর-সঙ্গিনী সেই দুই বোনকে দেখতে চান বিমলেন্দু। তাদের যে ভাবে কাছে পেয়েছিলেন, তেমনি কাছে পেতে চান। কিন্তু জ্যোৎস্না আর জয়ন্তী তেমন এগোয় না। তারা তাদের বাবাকে যেন এড়িয়ে যেতে চায়। বিমলেন্দুর মনে পড়ে, তিনি নিজেও তাঁর বাবাকে ওই রকমই এড়াতে চেয়েছেন, পারতপক্ষে কাছে যাননি। এ কি তারই শাস্তি? টুনু আর রুনুর মধ্যে যেমন ভাব ছিল, জ্যোৎস্না আর জয়ন্তীর মধ্যেও সেই সদ্ভাবই আছে। মাঝে মাঝে ওদের ঝগড়া-ঝাঁটি যে হয় না তা নয়, মান-অভিমান কথা-বন্ধ সবই চলে, আবার মনের কথার আদান প্রদানও খুবই হয়। জ্যোৎস্না বয়েসে বড় দেখতে ছোট, জয়ন্তীকেই লোকে দিদি বলে ভাবে। ঠাকুরমার ধমকানিতে ওকে অল্প বয়সেই শাড়ি পরতে হয়েছে। প্রথম প্রথম শাড়ি পরতে ওর ভারি আপত্তি ছিল। আজকাল শাড়িই ওর পছন্দ। রঙ-বেরঙের শাড়ি প্রায় মাসে মাসেই আসে। মাঝে মাঝে ওদের দুই বোনের আলাপ কানে যায় বিমলেন্দুর। কোন কোন সময় কৌতুক করে আড়ি পেতেও শোনেন।

জয়ন্তী বলে, 'জানিস দিদি, ঠাকুরমা কি অসভ্য?'

জ্যোৎস্না বলে, 'কেন রে?'

জয়ন্তী বলে, 'কাল কাকাকে পথে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমি তো রোজই অমন ধরি। কাকার সঙ্গে

যে বাইরের লোক ছিল, আমি তো দেখতে পাইনি। সত্যি বলছি দেখতে পাইনি দিদি। দেখলে কি আর অমন করতাম? ঠাকুরমা যেন কি করে দেখতে পেয়েছিল। দেখে কি বকুনি— শাড়ি পরেছিস, ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছিস, তোর সে খেয়াল নেই? তুই এখনও ওইরকম দাপাদাপি ঝাপাঝাপি করবি?'

জ্যোৎস্না দিদির মত গাম্ভীর্য নিয়ে বলে, 'সত্যিই তো।'

জয়ন্তী চটে ওঠে, 'সত্যিই তো! তুই তো সব সময় আমার বিরুদ্ধে। লোকে সবাই আমাকে বড় ভাবে, সেই হিংসেয় তুই মরিস। মুরুব্বিয়ানার সুযোগ পেলে আর ছাড়িসনে। তুই কি আমার আর জন্মের সতীন ছিলি?'

জ্যোৎস্না এবার বিরক্ত হয়, 'ঠাকুরমার কাছ থেকে কি বিশ্রী বিশ্রী কথাগুলিই না তুই শিখেছিস জয়ন্তী! সতীন-ফতিনের তুই কি বুঝিস শুনি?'

জয়ন্তী হেসে বলে, 'তোর চেয়ে ঢের বেশি বুঝি। তোর তো বিয়ের কথা হচ্ছে, একবার বিয়েটা হয়ে নিক। তখন দেখবি বুঝি কি না বুঝি। জানিস দিদি, আমার কিন্তু মাঝে মাঝে সতীন হতে ভারি ইচ্ছে করে।'

জ্যোৎস্না বলে, 'তোর ইচ্ছের বালাই নিয়ে মরি। ইঁচড়ে পাকা মেয়ে কোথাকার, ক্লাসে বুঝি এইসব কথাই তোদের হয়?'

জয়ন্তী বলে, 'আহা চটিস কেন। ক্লাসে কেন হবে। তবে দিদিমণিদের মধ্যে হয় বৈকি। আমি আড়াল থেকে মাঝে মাঝে শুনি। জানিস সুলতাদিরও একজন সতীন আছে। বিয়ে-

করা সতীন নয়, না-বিয়ে-করা সতীন। আমার কিন্তু সত্যি-কারের সতীন হতে ইচ্ছে করে। সেকালের রাজাদের সুয়ো-রাণী দুয়োরাণীর মত। তবে কোন রাণী হব ভেবে ঠিক করতে পারিনে। একবার সুয়ো একবার দুয়ো, একেক সময় একেক রাণী হতে মন চায়। আমি কোন্ রাণী হব বলতো ?'

জ্যোৎস্না বলে, 'তুই মেথরাণী হবি, চাকরাণী হবি—হতভাগা পাপী মেয়ে কোথাকার।'

বিমলেন্দু পা টিপে টিপে ফিরে আসেন। অশোভন ভাবে আড়াল থেকে নিজের কিশোরী মেয়েদের গোপন আলাপ শুনেছেন সেজন্যে তাঁর লজ্জা বোধ হয় না। তিনি বিস্মিত হন, এত অল্পবয়সে তাঁর জয়ন্তী সু আর কু-এর দ্বন্দ্ব টের পেল কি করে ? একই মানুষের যে দুই সত্ত্বা একই সঙ্গে সে যে Saint আর Devil এ তত্ত্ব ও বুঝল কি করে ?

বিমলেন্দু ভাবেন—মাকে একটু সাবধান করে দেবেন। দেহের গড়নে হঠাৎ ও বেড়ে গেছে বলে ওর মনে অকালে যৌন চেতনা তাঁরা যেন কেউ না এনে দেন। সেকালের অবৈজ্ঞানিক গেঁয়ো ভঙ্গিতে কেউ যেন ওকে শাসন না করেন। অহেতুক বিধি-নিষেধে ওকে যেন কেউ না বেঁধে রাখেন। কিন্তু মাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে লজ্জাবোধ করেন বিমলেন্দু। বললেন স্ত্রীকে—'তোমার ছোট মেয়ের দিকে একটু লক্ষ্য রেখো।'

ইন্দিরা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'রাখছি গো রাখছি। বাবা বলেন,

মা বলেন, এরপর আবার তুমিও ওই একই ধুয়ো গাইতে শুরু করলে। কেন আমার ছোট মেয়ে তোমাদের করেছে কি?'

বিমলেন্দু হেসে বলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করবে?' আমি ঝগড়ার কথা কিছু বলিনি।'

ইন্দিরা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তবে এই রাতদুপুরে কি বলছ, স্পষ্ট করে বল। বড্ড খাটুনি গেছে আজ।'

বিমলেন্দু একবার বলতে চাইলেন—রাত দুপুরের কথা লোকের অস্পষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রীর মেজাজের কথা ভেবে সে কথা বললেন না। হেসে মোলায়েম সুরে বললেন, 'আমার বাবা-মা যা বলেন, আমি তার উল্টো কথাই বলছি, আমি বলি অন্বিতার ওপর অত কড়াকড়ি কোর না। ও যে বড় হয়েছে, হঠাৎ সে কথাটা ওকে তারস্বরে জানিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। বরং ও আগে যেমন অবাধে স্বাধীনভাবে চলত, সেই ভাবেই চলুক। ওর নিজের খুশিমত ছুটোছুটি করুক, খেলা করুক, বেড়িয়ে বেড়াক। ওকে কিছুতে বাধা দিও না।'

ইন্দিরা বলল, 'তোমার যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা। তাই কি হয় নাকি? ওকে কি আর আগের মত ছেড়ে দেওয়া যায়? কি যেখানে সেখানে যার তার বাড়িতে যেতে দেওয়া যায়? জানো না তো, পাড়ায় কি সব ছেলে এক-একটি আছে। মেয়ের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

হঠাৎ ইন্দিরা হেসে ফেলল।

বিমলেন্দু বললেন, 'কি ব্যাপার, হাসছ যে?'

ইন্দিরা তবুও হাসতে লাগল।

বিমলেন্দু কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, 'হয়েছে কি ?'

ইন্দিরা তখন বলল, 'মুখপুড়ীর কাণ্ড শুনবে ? ঠাকুরপো ওর জন্মাবধি ওকে কাছে ডেকে নিয়ে কপালে একবার করে চুমু খেত। আর কিছুদিন আগেও তাই নিয়ে ও কত কাণ্ড করত। নালিশের ভঙ্গিতে বলত, কাকু, তুমি আমার কপালের কুঙ্কুমের ফোঁটা মুছে দিলে। কিন্তু সেদিন হয়েছে কি জানো। ও তো ওর নতুন নীলচে রঙয়ের শাড়িখানা পরে পিঠের ওপর এলো-চুলের গোছ ছেড়ে দিয়ে সেজেগুজে ঠাকুরপোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরপো যাবার সময় আগের মতই ওর কপালে চুমু খাবে আশাটা এই। কিন্তু ঠাকুরপো আর এগোয় না। মা সেদিন বকাবকি করেছিলেন, ওর সে কথা মনে আছে তো। জয়ন্তী যত ডাকে কাকু শোন, ঠাকুরপো তত বলে, আমার কাজ আছে। যাও এখন।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তারপর ?'

ইন্দিরা বলল, 'তারপর মেয়ে তো আমার কাছে এসে এই নালিশ। ব্যাপার বুঝে আমি তো আর হাসি চাপতে পারিনে। আমি যত হাসি ও তত চটে। শেষে আমি বললাম, চুমু না খেলে তোর কপাল যদি চড় চড় করে, যা গিয়ে তোর দাদুর কাছে। ও বলল, ইস, আমার বয়ে গেছে। বুড়ো মানুষের দাঁত, মুখে তামাকের গন্ধ। শোন কথা। তোমার এই ছোট মেয়ের জন্যেই আগে বর ঠিক কর, নইলে ওকে ঘরে রাখতে পারবে না।

বড় মেয়ের ভাবনা পরে ভেবো।'

বিমলেন্দু সেই সময় কোন মেয়ের বিয়ের ভাবনাই ভাবতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু তিনি রাজী না থাকলে কি হবে, মেয়ের অভিভাবক তো তিনি একা নন। বিমলেন্দু ভেবেছিলেন, বড় মেয়েকে অন্তত বি-এ পর্যন্ত পড়াবেন, তারপর বিয়ে দেবেন। যদি স্বামী-সুখী না হয়, ওর যেন আরো দু-একটা পথ খোলা থাকে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মত অন্য একটা কিছু অবলম্বন পায়। তাছাড়া এমনিতেও বুঝেশুনে চলবার পক্ষে লেখাপড়াটা দরকার। কিন্তু তিনি দরকার মনে করলেই তো হবে না। মাথার ওপর তাঁর বুড়ো বাবা রয়েছেন। তিনিই জ্যোৎস্নার সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। ছেলে বি-এ পাশ। রেলওয়েতে ভালো চাকরি করে। বাপ, মা, ভাই, বোন সব আছে। সবচেয়ে বড় কথা—যাদবপুরে বাড়ি করেছে নিজেরা। মেয়ে দেখে এবং পরিবারের আদব-কায়দা দেখে যদি পছন্দ হয়, তারা দেনা-পাওনা নিয়ে কোন আপত্তি করবে না।

বিমলেন্দু বললেন, 'কিন্তু বাবা, আপনি এখনই খুকির বিয়ে দিতে চাইছেন কেন? সবে তো ম্যাট্রিক পাশ করেছে ও, আরো পড়ুক। তারপর দেখে শুনে—'

বাবা রেগে উঠে বললেন, 'মেয়েকে কি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করতে চাস নাকি? বেশ তোমার যা খুশি তাই কর। জীবনে তুমি আমার কোন্ কথাটাই বা শুনেছ যে আজ শুনবে!

আমি তোমার নামে মাত্র বাপ। তুমি কোনদিন আমাকে শ্রদ্ধাও করনি, ভালোও বাসনি। চিরকাল ঘৃণা করে এসেছ। দয়া করে দুবেলা দুমুঠো দিচ্ছ—।'

বিমলেন্দু প্রতিবাদ করে বললেন, 'বাবা, এসব কি বলছেন আপনি ?'

কিন্তু বাবা থামলেন না। সেই সঙ্গে মাও যোগ দিলেন। নিজের বিয়ে নিয়ে যে দোটানা আর অশান্তির মধ্যে পড়েছিলেন বিমলেন্দু, আঠার বছর পরে মেয়ের বিয়ে নিয়ে সেই একই ব্যাপার ঘটল। সপ্তাহ খানেক ধরে ঝগড়া-ঝাঁটি, কান্নাকাটি, মান-অভিমান, গালাগাল, অভিশাপ সবই চলতে লাগল। বিমলেন্দুর বাবা বললেন, 'তাঁকে যদি তাঁর কথার খেলাপ করতে হয়, তিনি আর ছেলেদের সঙ্গে থাকবেন না। যেখানে খুশি চলে যাবেন। বললেন বটে যাবেন, কিন্তু গেলেন না। নিজের ঘরে না খেয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলেন।

অমল বাবার মতই রক্ষণশীল হয়েছে। ওপরে যতই শক্ত হোক, কারো চোখের জল দেখলেই ও গলে যায়। সেই জলে ভেসে যায় ওর সমস্ত যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিবেচনা। একতলার বিতর্কসভা থেকে উঠে এসে অমল বিরক্ত হয়ে অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, 'দাদা, একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি কেন এত হাঙ্গামা করছ ?'

বিমলেন্দু গম্ভীরভাবে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার কাছে তা নাও হতে পারে। এ হল Principle নিয়ে কথা।'

অমল বলল, 'বেশ তেমন মনের জোর যদি থাকে তোমার, Principleকে আঁকড়ে ধরে থাক। কিন্তু শক্ত হয়ে থাকা চাই। আজ এক কথা, কাল আর এক কথা বলতে পারবে না। Principle কথাটা তাদের মুখেই শোভা পায়, যারা তার জন্যে ত্যাগ করতে জানে। সেজন্য অনেক ছাড়তে হয়, অনেককে ছাড়তে হয় দাদা। তুমি সে জাতের লোক নও। বেশ, তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর।'

ভাইয়ের এই রূঢ়তায় মনে মনে ভারি আহত হলেন বিমলেন্দু। কিসের জন্যে ওর এই শাসানি আর চোখ রাঙানি। চিরকুমার রয়েছে সে তো আর তাঁর জন্যে নয়, সুমিতার কাছে নিজের বড়াই রাখবার জন্যে; নিজের কাছে নিজের বড়াই রাখবার জন্যে। সুমিতা বলেছিল, 'আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।' অমল বলেছিল, 'আমি তোমাকে যদি না পাই আর কাউকে চাইনে।' সেই প্রথম তারুণ্যের দম্ভকে বজায় রাখতে গিয়ে অমল নিজেকে এমনভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে। এযুগে কেউ অমন ভুল করে? কোন্ বস্তুকে মূল্য দিচ্ছে অমল? সত্যিকারের প্রেমকে, নিষ্ঠাকে, না নিজের সেই জেদকে? অমল তো জানে না—ওর সেই জেদ, ওর আত্মবঞ্চনার রিক্ততা ওর চরিত্রের সমস্ত মাধুর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। ওর ভাষা রূঢ়, স্বভাব স্থূল আর কর্কশ, কোমলতার নামগন্ধ নেই ওর চালচলনে। মনে মনে ওর তীব্র সমালোচনা করেন বিমলেন্দু। বিক্ষোভে বিদ্বেষে তাঁর মন ভরে যায়। তিনি

এমনও ভাবেন স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য যায়গায় চলে যাবেন, দরিদ্র হয়ে থাকবেন, শাকান্ন খাবেন, তবু নিজের Principle নিয়ে চলতে পারেন কি না দেখাবেন ভাইকে।

কিন্তু ইন্দিরা এসে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'তুমি এই নিয়ে কেন সবাইর সঙ্গে চটাচটি করছ? ওঁরা তো ঠিকই বলছেন।'

বিমলেন্দু বলেন, 'কী ঠিক বলছেন ওঁরা? আমার মেয়ের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি বুঝবার কার শক্তি আছে?'

ইন্দিরা বলল, 'ছিঃ, অমন স্বার্থপরের মত কথা বলো না। তোমার মেয়েকে বাবা-মা-ঠাকুরপো সবাই ভালোবাসেন। আজ হোক কাল হোক, দু'দিন বাদে বিয়ে তো ওর দিতেই হবে। সেখানে গিয়ে ও যদি সবাইর ভালোবাসা পায়, তাহলে বুঝবে তোমারও ভাগ্য ভালো, ওরও ভাগ্য ভালো। তোমার একার ভালোবাসায় তো ওর সারাজীবন কাটবে না।' কথার শেষে ইন্দিরা হেসে স্বামীর পিঠে হাত রাখল।

বিমলেন্দু নরম হয়ে বললেন, 'কিন্তু এত অল্প বয়েসে ওর বিয়ে দিয়ে—। আমি ভেবেছিলাম, ওকে আরো পড়াব—।'

ইন্দিরা বলল, 'খুকি তো পড়াশুনোয় তত ভালো নয়। ম্যাট্রিকটা কোন রকমে পাশ করেছে। বরং জয়ন্তী ওর চেয়ে—। তাছাড়া তোমার আরো দুটি বাচ্চা আছে, তাদেরও পড়াতে হবে। তোমার কত দায়িত্ব। পাত্রপক্ষ নাকি বলেছেন, বিয়ের পর মেয়ে যদি পড়তে চায় ওঁরা নিজেরাই পড়াবেন। সেই

ভালো, ওর উচ্চ শিক্ষাও হবে, তোমারও খরচ লাগবে না। তাছাড়া আরো কথা আছে। টাকা তো ঠাকুরপোই দেবে। এখন বোধ হয় কিছু আছে। কিন্তু মতিগতির তো কিছু ঠিক নেই। হয়তো ওই টাকায় আর একজনের কন্যাদায় উদ্ধার করে বসল, কি সমিতির ফাণ্ডে দান করে দিল। দেখ, যারা বিয়ে-থা করে তাদের ধরণ, ধারণ তবু বোঝা যায়, কিন্তু তা যারা করে না তারা ঝোঁকের মাথায় চলে। তাদের তালে তাল না দিতে পারলে—'

বিমলেন্দু বললেন, 'থাক, থাক।'

স্ত্রীর এই সংসারিক বুদ্ধিকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না বিমলেন্দু, আবার পুরোপুরি অগ্রাহ্য করার মত মনের জোরও পেলেন না। তার ফলে নিমরাজী হলেন। নিজের বিয়ের বেলায় যেমন হয়েছিলেন। হঠাৎ কি মনে হ'ল। তখন বিয়ে সম্বন্ধে ভাবী স্ত্রীর মত জিজ্ঞাসা করতে পারেননি। তা নিয়ে ইন্দিরা মাঝে মাঝে খোঁটা দেয়। 'কেন করলে বিয়ে? না করলেই পারতে। আমি তো আর যেচে আসিনি।' কিন্তু এখন বিয়ে সম্বন্ধে নিজের মেয়ের মত জানবার সুযোগ হয়েছে। ও যদি অসম্মতি জানায় তাহলে বিমলেন্দু খানিকটা জোর পাবেন মনে। জ্যোৎস্নাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন তিনি। ষোল উতরে সতেরয় পড়েছে মেয়ে। শ্যামবর্ণ, ছোটখাট চেহারা। ভিজে চুলের রাশ পিঠে ছড়ানো। লজ্জিত মুখে

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল জ্যোৎস্না, মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে ডেকেছ বাবা?'

তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান। এতদিন কাছে কাছে ছিল, চোখে চোখে ছিল, এবার পর হয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে। সবাই ষড়যন্ত্র করছে ওকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। বিমলেন্দু হঠাৎ গভীর এক মমতা অনুভব করলেন মেয়ের জন্যে। বাপ আর মেয়ে যে ঘন গভীর বাৎসল্যের সম্বন্ধে আবদ্ধ ওর সঙ্গে সেই সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন না। সচেতন না থাকাটাই তিনি গৌরবের মনে করতেন। আজ মনে হয়, তিনি ভুল করেছেন, পরম ভুল করেছেন। একটি স্বতন্ত্র সম্পর্কের বিচিত্র-মধুর স্বাদ থেকে তিনি ইচ্ছা করে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁর বোধ-শক্তির বাইরে, তাঁর মনশ্চক্ষুর আড়ালে জ্যোৎস্না আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছে। ওর দেহের এই পূর্ণতা তাঁর কাছে যেমন বিস্ময়কর, মনের স্বকীয়তাও তেমনি। তিনি সেই মনের কোন ক্রমবিকাশের খবর রাখেন না। বিমলেন্দুর মনে হ'ল তিনি যেমন কাছে ডেকে ওকে আদর করেননি, ওর শৈশবে কি বাল্যে বুকে জড়িয়ে ধরেননি, কপালে-গালে সস্নেহ চুম্বন করেননি, তেমনি ওর হৃদয়-মনের বিকাশের কোন সাহায্যও করেননি। এতদিন যা করেননি আজ তাই করতে ইচ্ছা হ'ল। বিমলেন্দুর, ওকে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছা করল, পিতৃহৃদয়ের সমস্ত বাৎসল্য ওর ওপর উজাড় করে দিতে ইচ্ছা করল। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। এখন ওকে ওভাবে আদর করতে গেলে ও লজ্জা

পাবে, অপ্রস্তুত হবে। এখন ওর মনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করতে চাইলে ও লজ্জায়-ভয়ে পিছিয়ে যাবে, কিছুতেই ধরা দেবে না।

'বাবা, আমাকে ডেকেছ?' জ্যোৎস্না আবার জিজ্ঞাসা করল।

বিমলেন্দু চমকে উঠলেন, বললেন, 'হ্যাঁ। আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক করে উত্তর দিবি। এই বিয়েতে তোর মত আছে? মানে এখন বিয়ে দিলে কি তোর ভালো লাগবে?'

বিমলেন্দু লক্ষ্য করলেন, এ-কথায় মেয়ের মুখ লজ্জায় শুধু আরক্ত হ'ল না, আড়ষ্টও হ'ল। ওর লজ্জা দেখে নিজেও লজ্জিত হলেন বিমলেন্দু। মনে মনে ভাবলেন, ছি ছি ছি, মেয়ে বড় হলে তার সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তা তিনি জানেন না। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললেন বিমলেন্দু, 'মানে এখন বিয়ে হলে তোর আপত্তি নেই তো?'

জ্যোৎস্না এ-কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে ভারী মৃদু স্নিগ্ধ আর কোমল স্বরে বলল, 'এই নিয়ে তুমি দাদুর সঙ্গে, কাকুর সঙ্গে বিবাদ কোরো না বাবা। ওঁরা আমার চেয়ে অনেক আগের, ওঁরা আমার চেয়ে তোমার অনেক আপন।'

বিমলেন্দু এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। এই তো সেদিনের খুকু। ও এমন করে পারিবারিক সম্পর্কগুলির কথা ভাবতে পারল কি করে? বিমলেন্দু হঠাৎ বললেন, 'আমার

কেউ পর নয় মা।' সমস্ত লজ্জা-সংকোচ ছেড়ে এই প্রথম মেয়েকে মা বললেন বিমলেন্দু, নিজের মাকে মেয়ের মধ্যে নতুন করে অনুভব করলেন, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এক গভীর অনন্যভূত একাত্মতা অনুভব করলেন। তাঁর কেউ পর নয়।

তাঁর এই সম্মতি, কি অর্ধসম্মতিটুকুই যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়ে গেল। তাঁকে প্রায় কিছুই দেখতে শুনতে হ'ল না। পাত্রপক্ষ এসে কনে দেখে গেলেন। কিন্তু এই কনে দেখার ব্যাপার নিয়ে মা এমন একটা কাণ্ড করলেন যা বিমলেন্দুর ঠিক মনঃপূত হল না। তাঁর মা জয়ন্তীকে প্রায় কোণের ঘরখানার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন, সব সময় আড়াল করে রাখলেন। তাকে পাত্রপক্ষের সামনে বের হতে দিলেন না।

জ্যোৎস্নাকেই সাজিয়ে গুজিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে এনে বসালেন।

বিমলেন্দু বললেন, 'ওকি মা, তুমি জয়ন্তীকে অমন সিন্দুকে ভরে রেখেছ কেন?'

মা হেসে বললেন, 'তুই এসব কিছু বুঝবিনে খোকা।'

'বলই না। না বুঝবার কি হয়েছে?'

মা বিমলেন্দুর অনেক কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'কে জানে বাবা, দুজনকে মিলিয়ে দেখলে হয়তো ছোটটিকেই ওরা পছন্দ করে বসবে। তাকেই তো বড় দেখা যায়। তাছাড়া সুন্দরীও সেই বেশি। তোর মনে নেই, তুই তখন অনেক ছোট।

আমার মাসতুতো দুই বোন গঙ্গা যমুনার বেলায় ঠিক এইরকম হয়েছিল। তারা গঙ্গাকে দেখতে এসে যমুনাকে পছন্দ করে বসলেন। এদিকে যমুনার সম্বন্ধ তখন অন্য জায়গায় ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু হলে হবে কি, পাত্রপক্ষ বললেন, আমরা দাবি-দাওয়া কমিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু আপনার ওই ছোট মেয়েটিকে চাই। মেসোমশাই বললেন, সে কি কথা, আমি যে তাঁদের কথা দিয়ে ফেলেছি। তা তো হতে পারে না। এই নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত গঙ্গার সেই সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। বড় মেয়ের বিয়ে না হলে ছোট মেয়ের তো আর বিয়ে হতে পারে না। যমুনার যে সম্বন্ধ পনের আনা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, শুধু পার করা বাকি ছিল, সে সম্বন্ধও ভাঙল। তারাই বা কতদিন অপেক্ষা করবে। দুই মেয়েকে পার করতে মেসোমশাইর বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।'

সব কথা শুনে বিমলেন্দু বললেন, 'কিন্তু সেই যুগ কি আর আছে মা?'

মা বললেন, 'আছে বাবা, সব ঠিক তাই আছে। মানুষ সেই একই রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে চলাফেরা করে। কিছুই বদলায়নি। তাছাড়া সোমত্ত মেয়েকে যার তার চোখের সামনে বের করতে নেই। কার চোখে কি আছে কে জানে!'

তবু বিমলেন্দুর ভালো লাগল না। এ কি হাট যে বাছাই করে জিনিস নেবে? তাছাড়া তাঁর মনে হ'ল জয়ন্তীর খুব কষ্ট হচ্ছে অমন একা একা এক ঘরে চুপ করে বসে থাকতে। তিনি

ঘুরে ঘুরে সেই কোণের ঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা টুল পেতে বসে জানালার দিকে মুখ করে জয়ন্তী কি একখানা বইয়ে গভীরভাবে মগ্ন আছে। তাকে যতটা নিঃসঙ্গ ভেবেছিলেন ততটা নিঃসঙ্গ তা হলে হয়নি জয়ন্তী। ওরও চুলের রাশে পিঠ ঢাকা। পরনে বেগুনি রঙের শাড়ি। বিমলেন্দুর মনে হ'ল, তাঁর এই মেয়েকে যে কোন রঙের শাড়িই মানায়। মনে পড়ল ইন্দিরাও ঠিক অবসর সময়ে এইভাবে বই পড়ত। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বিমলেন্দু। সেই অতীতের ইন্দিরাকে যেন আর একবার স্মরণ করলেন। তখন স্ত্রীর সৌন্দর্যই যথেষ্ট ছিল, যৌবনই যথেষ্ট ছিল, মাঝখানে কোন ব্যবধানই তখন ছিল না।

হঠাৎ জয়ন্তী মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল, 'বাবা! তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কি করছিলে বাবা?'

বিমলেন্দু একটু দম নিলেন, তারপর হেসে বললেন, 'আমি কিছুই করছিলাম না। কিন্তু তুই লুকিয়ে লুকিয়ে কি পড়ছিলি তাই বল?'

জয়ন্তী তখন বইখানাকে আঁচলের তলায় ঢেকে ফেলেছে, 'ও কিছু না বাবা।'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'কিছু না মানে' গোয়েন্দা কাহিনী?'

জয়ন্তী হেসে বলল, 'না-না, যাও। কে বলল তোমাকে?'

বিমলেন্দু বললেন, 'কে আবার বলবে? তোর রকম-সকম

দেখেই বুঝতে পারছি। সার্চ করলে এক্ষুণি একখানা আস্ত ডিটেকটিভ উপন্যাস তোর আঁচলের তলা থেকে বেরিয়ে পড়বে।'

জয়ন্তী লজ্জিত হয়ে বলল, 'বাঃ রে, সার্চ করবে কেন? আমি কি আসামী নাকি?'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'চুরি করে যদি পড়িস, তাহলে আসামী বৈকি। আর যদি চুরি না করে পড়িস—'

জয়ন্তী এক পা দু পা করে বিমলেন্দুর দিকে এগিয়ে এল, তারপর নির্ভয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি তো জানো না বাবা, এসব বই চুরি করে পড়তে যত মজা, দেখিয়ে পড়ায় তত মজা নেই। যেমন চোর হয়ে যত মজা ডিটেকটিভ হয়ে কিছুতেই তত মজা পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডিটেকটিভরাই জিতে যায়। চোর-ডাকাতেরা ধরা পড়ে। কিন্তু পুলিসকে তারা যত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, তত পড়তে বেশি ভালো লাগে।'

আস্তে সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রাখলেন বিমলেন্দু। এরই মধ্যে মেয়ে মাথায় তাঁর সমান হয়েছে। বাব্বাঃ, ওকে বিয়ে করবে কে? এ মেয়ের বর খুঁজতে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবে কি আফগানিস্থানে যেতে হবে।

বিমলেন্দু ওর পিঠে হাত দিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'না, লুকিয়ে কিছু পড়বিনে। আমার তো কোন নিষেধ নেই। নভেল নাটক যা তোর খুশি তাই পড়বি। তবে এখন থেকেই ভালো ভালো বই, ভালো ভালো অথরের লেখা পড়া দরকার। কিন্তু সব বাদ দিয়ে যদি শুধু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসই পড়িস

তাহলে চোর আর ডিটেক্‌টিভের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করবি। তার চেয়ে আর বেশি কিছু শিখতে পারবিনে।'

জয়ন্তী মুখভার করে বলল, 'বারে, আমি বুঝি আর কোন বই পড়িনে?'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'পড়িস, তবে গোয়েন্দার দিকেই তোর আকর্ষণ বেশি।'

জয়ন্তী বিমলেন্দুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক তার উল্টো। আমি বই খুলেই ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করি—ভগবান, এই বইটায় যেন ডাকাতের জয় হয়।'

মা এসে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'বাপ-মেয়েতে কি পরামর্শ হচ্ছে? জানিস খোকা। ওঁরা জ্যোৎস্নাকে খুব পছন্দ করেছেন, ঠিকুজী দেখলেন। একেবারে রাজযোটক।'

বিমলেন্দু বললেন, 'ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ কি? জানোই তো আমি ওসব মানিনে।'

মা বললেন, 'আহা, তুই না মানলে কি হবে, যাঁরা নেবেন তাঁরা তো মানছেন। এখন তাঁদেরই সব। এখন আর তোর বলে কিছু থাকবে না বাবা। মেয়ের বাবা হবার বড় জ্বালা। যাকগে, খুকিকে ওঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। সামনেই বলে গেলেন। বোস মশাই তোর খোঁজ করছিলেন, বললেন, যিনি বেয়াই হবেন, তিনি কই? তোর বাবা বললেন, আমার ছেলে বড় লাজুক। সংসারের কোন ব্যাপারের মধ্যে আসে না। আর আমি বর্তমান থাকতে তার আসার দরকারই বা কি?

আমার খুব বাধ্য ছেলে। এত বয়স হ'ল, তবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। কত প্রশংসা করলেন তোর।'

বিমলেন্দু বললেন, 'হুঁ।'

তারপর নিজের ঘরের দিকে এগুতে লাগলেন তিনি।

যেতে যেতে ঠাকুরমা আর নাতনীর কথা কানে গেল : 'ওঁরা তাহলে দিদিকে খুব পছন্দ করেছেন?'

'করবে না? তুই তো ভাবিস, তুই একাই দুনিয়ার সেরা সুন্দরী।'

'দুনিয়ায় সেরা না হই, দিদির চেয়ে সেরা। তুমি তো সেই ভয়ে আমাকে আটকে রাখলে। শিকল দিয়ে তো আর যাওনি, আমি যদি সত্যিই গিয়ে ওঁদের সামনে দাঁড়াতাম ঠাকুরমা, তাহলে কী হ'ত?'

'কী আর হ'ত, তোর রূপ দেখে সবাই একেবারে মুচ্ছো যেত।'

জয়ন্তী হেসে উঠল, 'যায় ঠাকুরমা, অনেকেই মূর্ছা যায়।'

বিমলেন্দু মনে মনে কানে আঙুল দিয়ে দ্রুতপায়ে বারান্দা-টুকু পার হয়ে গেলেন। মনে মনে হাসলেনও একটু। মেয়েটা ভারি ফাজিল হয়েছে।

জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের নাম সঞ্জয় রায়। মোটামুটি সুদর্শন ছেলে। ফাজিলও নয়, বোকাও নয়। জামাই

দেখে পছন্দ হ'ল বিমলেন্দুর। একান্তে ডেকে আলাপ করলেন। অফিসের কাজকর্ম কেমন লাগে, পড়াশুনোর অভ্যাস এখনো রেখেছে কিনা এই সব। খুকির সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করলেন তিনি। ওসব জানবার জন্মে বাবা আছেন, মা আছেন, ইন্দিরা আছে। ওসব কথা তাঁর জিজ্ঞাসা না করলেও চলবে। তবু বড়ই সেকেলে ধরণে বিয়ে হ'ল ওদের, বিমলেন্দু কথাটা না মনে করে পারলেন না। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর মেয়ে আরও বড় হবে, যাকে বিয়ে করবে তার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্টতা হবে, তারপর নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করবে। কিন্তু শুভদৃষ্টির আগে ওরা কেউ কাউকে দেখলই না। দৃষ্টি বিনিময়ের আগে শুধু ছেলেমেয়ের ফটো বিনিময় হয়েছিল। বিমলেন্দুর বাবা নিজের যুগ আর নিজের জেদ এ ব্যাপারেও বহাল রেখেছেন। আর তাঁর ইচ্ছাকে কাজে রূপ দেওয়ার জন্মেই যেন অমলেন্দুর জন্ম। অবশ্য অমল খেটেছে খুব। টাকা-পয়সার ব্যবস্থা থেকে স্থুরু করে, গয়না গড়ানো, যৌতুক, আসবাবপত্র, লোকজনকে নিমন্ত্রণ করা, ছাদে মেরাপ বাঁধা, রান্নবান্না, পরিবেশনের তদারক করা সবই অমল করেছে। একা করেনি, ওর সেই কর্মীসঙ্ঘকে খবর দিয়ে এনেছিল, তারা পিলপিল করে পিঁপড়ের মত ছেয়ে ফেলেছিল বাড়ি। বিমলেন্দু তাদের দেখে স্বস্তি বোধ করেননি। কিন্তু কর্মকাণ্ডে তারাই সহায়। বিমলেন্দুর অস্বস্তিকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। কারণ তারাই বরযাত্রীর সম্বর্ধনা করেছে। আত্মীয়-কুটুম্বদের

মধ্যে যাঁরা দূর থেকে এসেছেন অথচ লজ্জায় খেতে বসতে পারছিলেন না তাঁদের যত্ন করে আপ্যায়ন করছে। বরং বিমলেন্দু যেভাবে জামাজুতো পরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেরিয়েছেন, তাতে তাঁকেই বাড়ির অতিথি কি বরযাত্রীর দলের কেউ বলে বর-পক্ষীয়েরাই ভুল করেছেন। মেয়ের বিয়েতে নিজের হাতে কিছু কাজ যে তাঁর করবার ইচ্ছা ছিল না তা নয়। কিন্তু যে কাজেই হাত দিতে গেছেন, আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছেন, 'থাক থাক, তোমায় এসব করতে হবে না। আমরাই তো আছি।'

মানে তিনি সব কাজেই অপটু। কোন কাজই তিনি করতে জানেন না। তিনি যাতে হাত দিতে যান সেই কাজই বরং নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ছেলেবেলা থেকে অকর্মণ্যতার এই সস্নেহ প্রশ্রয়ে তিনি পুষ্ট হয়েছেন। আর বড় হওয়ার পর কর্মময় কঠিন জগৎ তার শোধ নিয়েছে। তাঁর কপালে অকেজো লেবেল এঁটে বাতিল করে দিয়েছে তাঁকে। বিমলেন্দু বিয়ে-বাড়ির উৎসব আনন্দ কোলাহলের মধ্যে পরম এক নিঃসঙ্গ মানুষের মত ঘুরে ঘুরে দেখেন আর ভাবেন, কেউ তাঁর মতামতের অপেক্ষায় নেই। বাড়ির কর্মকর্তা অমলেন্দু। আচার-অনুষ্ঠান কি নিয়ম-কানুনের কোন ব্যাপার হলে বুড়ো-কর্তা তাঁর বাবা। বিমলেন্দু না এযুগের না সেযুগের। তাঁর মধ্যে কোন যুগচিহ্নই নেই। নিজেকেই নিজে সমালোচনা করেন বিমলেন্দু, আকৃতি-প্রকৃতিতে নিজের রূপান্তর তিনি দেখতে চান,

নিজের মধ্যে যুগান্তরকে অনুভব করতে চান। কিন্তু তাঁর কোন কিছুই কল্পনা ভাবনা ধারণার গণ্ডীর বাইরে আসে না। আজ তিনি স্বীকার করেন, Action is better than ontemplation, যে ধারণা ভাষায় রূপ নেয় না, কর্মে রূপান্তর গ্রহণ করে না, তার কোন মূল্য নেই।

বিয়ে-বাড়ি তো নয়—এক লাইট-হাউস। বাইরে আলো, ভিতরে আলো। মা এক সময় এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন, 'কি খোকা, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে না আজ?'

বিমলেন্দু একটু হেসে বললেন, 'হুঁ।'

মা বললেন, 'কি ছেলেরে বাবা, তবু একবার মুখ ফুটে বলবে না ভালো লাগছে, আমি খুশি হয়েছি। একটা দুঃখ রয়ে গেল, টুনু-রুনু কেউ আসতে পারল না।' সে কথা বিমলেন্দুরও মনে হয়েছে। টুনুর শ্বশুর মরণাপন্ন, রুনু অন্তঃসত্ত্বা। কারোরই আসবার উপায় নেই।

বাবা খোলা গায়ে হুঁকো টানতে টানতে এসে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'আমার বাবাজীবনের খবর কি? দেখেছ গিন্নী, আমারও কন্যাদায় ছিল, আর আজ আমার খোকারও কন্যাদায়। কিন্তু দুজনের চেহারা আর রকম-সকমের তফাৎটা দেখতে পাচ্ছ তো? ওর জামাই এসে ওকেই যে জামাই বলে ভুল করবে।'

মা বললেন, 'তা করুক। তোমার মাথার ওপর তখন কেউ

ছিল না, আর ওর মাথার ওপর তুমি আছ। ওর ভাবনা কিসের?'

বাবা বললেন, 'না, তোমাকে কিছু ভাবতেও হবে না, করতেও হবে না। তুমি শুধু তোমার বন্ধুদের দেখ। তাদের একটু খোঁজখবর নিও। আমি তো সবাইকে চিনিনে। কারো যেন কোন অযত্ন না হয়।'

বিমলেন্দু বেশি বন্ধুবান্ধবকে বলেননি। বন্ধুর সংখ্যা তাঁর খুবই কম। এসব সামাজিক পারিবারিক ব্যাপারে টেনে এনে তাঁদের অনেকেই তিনি বিব্রত করতে চান না। অফিসের কয়েকজন সহকর্মীকে বলেছেন। আর বলেছেন কৈশোরবন্ধু জয়দেব চাটুয্যেকে। পুলিশ কোর্টের উকিল। দুজনের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল এখন কম। কেউ কারো ভাবনা ধারণার খোঁজ রাখেন না। দুজনের মানস লোকের মধ্যে এখন যে তফাৎ, আস্তিক হিন্দুর ইহলোক পরলোকের ব্যবধান তার চেয়ে কম। আগে দুজনের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা ছিল। ক্লাসে কোনবার বিমলেন্দু ফার্স্ট হতেন, কোনবার জয়দেব। এখন আর প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্ন ওঠে না, সহযোগিতারও নয়। তবু জয়দেব বন্ধু বৈকি। সামাজিকতা রেখেছে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে। ওঁর স্ত্রী বিমলেন্দুর মেয়েকে একটি আংটি দিলেন।

জয়দেব এসে বিমলেন্দুর কাঁধে এক বিরাট ওজনের চাপড় দিল। সোনা বাঁধানো দাঁতে হেসে বলল, 'এক ব্যাপারে

তুমিই কিন্তু জিতে গেলে বিমল, তুমিই আগে শ্বশুর হয়ে বসলে। আমার শ্বশুর হতে এখনও অনেক দেরি। আমার ছেলেরা বড়, মেয়েরা ছোট। আমার শ্বশুর হতে অনেক দেরি।'

বিমলেন্দু নিজের ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'অসুর কিন্তু এখনই হয়ে বসেছ। উঃ, তোমার আদরের চোটে আমার ঘাড় থেকে মাথাটা খসে পড়েছিল আর কি।'

মেয়ের মা ইন্দিরাকে আর চোখেই পড়ে না। এখন এর সঙ্গে তখন ওর সঙ্গে কথা বলছে। কখনো আঁচলের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে অমলের হাতে টাকা বের করে দিচ্ছে, কখনো ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে বকুনি লাগাচ্ছে কাকে। পরনে আধময়লা শাড়ি। মা বকে বকে আর একখানা ভালো শাড়ি ওকে পরালেন। শাড়ি বদলে আবার ও অন্য কাজে চলে গেল। বিমলেন্দু একপাশে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করলেন। কিন্তু স্বামীকে ইন্দিরার চোখেই পড়ল না বিমলেন্দুর মনে হ'ল, এই মুহূর্তে সে তাঁর স্ত্রী নয়। সে এখন শুধু জ্যোৎস্নার মা, বাড়ির গৃহিণী।

কিন্তু একটু বাদে এই ইন্দিরাই একজন অপরিচিতা মহিলাকে তাঁর সামনে নিয়ে এসে মুখ টিপে হেসে বলল, 'দেখ তো, চিনতে পার কিনা। বিমলেন্দু প্রথমে চিনতে পারলেন না। মোটাসোটা দীর্ঘাঙ্গী অভিজাত ঘরের এক মহিলা। তবে খুব বেশি সাজসজ্জা করে আসেননি। তা সত্ত্বেও চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। ইন্দিরা হেসে বলল, 'চিনলে না তো? তুমি একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছ। আমাদের সুমিতা।'

সুমিতা স্মিতমুখে নত হয়ে বিমলেন্দুকে প্রণাম করে বলল, 'ভালো আছেন দাদা? বউদি কিন্তু আপনাকে মিথ্যে খোঁটা দিয়েছেন। অন্নপূর্ণার ব্যজস্তুতি। বুড়ো বলে আপনাকে মোটেই মনে হয় না।'

অতগুলি কথার জবাবে বিমলেন্দু শুধু বলতে পারলেন, 'ভালো আছ?'

সুমিতা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। ইন্দিরা বলতে লাগল, 'ওর স্বামী এখন ম্যাজিস্ট্রেট। জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টে বদলি হয়েছেন। একটি ছেলেও একটি মেয়ে। কিন্তু কাণ্ড দেখ, কাউকে সঙ্গে আনেনি। বড়লোক কিনা।'

সুমিতা সে কথা স্বীকার করে বলল, 'ঠিকই বলেছেন বউদি, তারা সব বড়লোক, কিন্তু আমি গরীব, আমি তাই এসেছি।'

মেয়েদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সুমিতাকে নিয়ে ইন্দিরা চলে গেল।

বিমলেন্দু ভাবলেন, সুমিতার ওই কথাগুলির সত্যিই কি কোন বিশেষ অর্থ আছে? কোন নিগূঢ় মধুর ব্যঞ্জনা, না কি এ শুধু নিছক ভদ্রতা, সৌজন্য কথার ভঙ্গি। সত্যিই কি অমলেন্দুর ওপর ওর কিছুমাত্র আকর্ষণ আছে? আর সেইজন্যেই কি এই সামাজিক নিমন্ত্রণে বাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে একা এসেছে সুমিতা? কয়েক মুহূর্তের জন্যে অমলেন্দুকে তার একাকিত্বের স্বাদ দিতে এসেছে? কে জানে? আর অমলেরও তো সাহস কম নয়, ঔদার্য কম নয়। কাজের পরেও ভাইঝির

বিয়েতে সুমিতাকে সে গোপনে গোপনে নিমন্ত্রণ করেছে। আর সুমিতাও সামাজিক স্তরভেদ ডিঙিয়ে সব লজ্জা-সংকোচ এড়িয়ে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে। বিমলেন্দুর মনে হয়, তবে কি ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া আর বেশি কিছু ছিল না? প্রেমের অপমান, প্রেমের ব্যার্থতা কি অত সহজে ভোলা যায়, না ভোলা উচিত? কিছুই বুঝতে পারেন না বিমলেন্দু। না কি ওদের প্রেমকে আরও স্বাভাবিক আরও মহত্তর করতে পেরেছে ওরা? ব্যর্থতাকে স্বীকার করেনি, ভুলভ্রান্তিকে অস্বীকার করেছে, সাংসারিক জীবনে সফল হবার চেষ্টা করেছে সুমিতা, সামাজিক ক্ষেত্রে সাধ্যমত সার্থকতার পথ খুঁজেছে অমলেন্দু। সুমিতার বাবা নাকি আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছিলেন, বিমলেন্দু পরে শুনেছেন। ওরা কাউকে নিহত হতে দেয়নি। কিন্তু অমল? অমলের তো সবদিক পূর্ণ হ'ল না, ও তো অসম্পূর্ণ রইল।

হঠাৎ ভাইয়ের জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিমলেন্দুর। তিনি ভাবেন, যেমন করেই হোক ওকে বিয়েতে রাজী করাতে হবে। এখনও সময় আছে। ভাবতে ভাবতে তিনি ছাদে উঠতে থাকেন। সেখানে জনকয়েক অফিসের বন্ধু খেতে বসেছেন। একটু খোঁজখবর না নিলে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন। আবার সুমিতার কথা মনে পড়ে বিমলেন্দুর। তাকে তিনি চিনতে পারেননি। কি করে চিনবেন? মাত্র একবার তিনি দেখেছেন ওকে। তাও অনেক আগে। এই কলকাতাতেই বেড়াতে এসেছিল সুমিতারা। অমল পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর ওর চেহারার অনেক

পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অমলের নিশ্চয়ই চিনতে ভুল হয়নি। সুমিতাকে সে কি ভুলতে পারে? ওদের কি এখনও মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয়? নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে। না হলে হঠাৎ অমলই বা নিমন্ত্রণ করবে কেন, সুমিতাই বা আসবে কেন?

ভাবতে ভাবতে ছাদে উঠছিলেন বিমলেন্দু। হঠাৎ একটি লোকের সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলেন। লোকটি রসগোল্লার বালতি হাতে ওপর থেকে নিচে নামছিল। ধাক্কার চোটে বালতির রস খানিকটা চলকে পড়ে গেল। বিমলেন্দুও গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছিলেন, লোকটিই বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে বলল, 'Sorry, একটু দেখেশুনে চলতে পারেন না মশাই? দিলেন তো খানিকটা রস নষ্ট করে।'

পিছন থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, 'ও গোবিন্দদা, তুমি কাকে কি বলছ? উনি যে অমলদার দাদা। ওঁরই তো মেয়ের বিয়ে।'

ব্যথা পেয়ে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন বিমলেন্দু। হঠাৎ লোকটি ভারি অপ্রতিভ হয়ে খানিকঠা জিভ কেটে রসগোল্লার রসে ভেজা হাত দিয়ে বিমলেন্দুর পায়ের ধুলো নিল। তিনি নিজের আঘাত ভুলে লোকটির দিকে চেয়ে দেখলেন। অত বড় বিশালকায় পুরুষের সলজ্জ ভঙ্গিটুকু দেখবার মত। লম্বায় ছ' ফুটের বেশি ছাড়া কম হবে না। চওড়ার অনুপাতও সেই রকম। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। পুরু ঠোঁট, চ্যাপ্টা

ধরণের নাক। দেহের গড়ন সুন্দর নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে কোথায় যেন একটা শ্রী আছে। তা প্রথম দিনেই লক্ষ্য করেছিলেন বিমলেন্দু। গায়ে সেদিন ওর হাফশার্ট ছিল। ঘামে ভেজা, বোতামগুলির একটিও আটকান ছিল না। নগ্ন রোমশ বুকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বিমলেন্দু ঠিক সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটির গায়ে যেমন পশুর মত লোম, তেমনি পশুর মত শক্তি। লোকটির চোখে মুখে কোথায় যেন একটা আদিম বন্য বর্বরতা ছড়িয়ে আছে। লোকটি কিন্তু সেদিন খুব সভ্য নাগরিক শিষ্টাচারের সঙ্গে বলেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।'

বিমলেন্দু এবার একটু হেসে বলেছিলেন, 'আপনার ক্ষমা চাওয়ার মত কিছু হয়নি।'

লোকটি বলেছিল, 'আপনি আমাকে আপনি আপনি করে লজ্জা দেবেন না। আমি দেখতেই এমন প্রকাণ্ড, কিন্তু বয়সে অনেক ছোট। আমাকে নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম গোবিন্দ।'

বিমলেন্দুর মনে হয়েছিল, তা হতে পারে। তাঁর ছোট মেয়ে জয়ন্তীর বয়স যে চোদ্দ তা ওর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শুনে কে বিশ্বাস করবে? চেহারা অনেক সময় বয়েসকে বাড়িয়ে দেখায়, অনেক সময় কমিয়ে দেখায়। তাছাড়া বয়েস দিয়েই মানুষের কতটুকু বিচার করা যায়? বিমলেন্দু শান্তভাবে বলেন, 'আচ্ছা গোবিন্দ, তোমার সঙ্গে পরে আরো আলাপ হবে।

এখন আমি একটু ওপরে যাচ্ছি। ওখানে আমার কয়েকজন বন্ধু—'

ছাদে যেতে বিমলেন্দু গোবিন্দের চেহারার কথাটা ভেবে আর একবার হেসেছিলেন। বিয়ের নিমন্ত্রণে মিষ্টি পরিবেশনের জন্যে অমল কোত্থেকে এই দৈত্যকে এনে জোটাল? পরিবেশনের আর লোক পেল না সে। ছেলেটি—ওর মুখখানা মনে করে গোবিন্দকে ছেলেমানুষ বলেই একবার মনে হল বিমলেন্দুর, বয়েস কমই হবে ওর। তেইশ-চব্বিশের বেশি হবে না। গোবিন্দ বোধ হয় অমলেন্দুর দলে নতুন এসেছে। এর আগে তো ওকে দেখেননি। কিন্তু অমলের দলের কজনকেই বা তিনি চেনেন কিংবা দু-একবার দেখে মনে রাখতে পারেন? তবে গোবিন্দকে দেখলে নিশ্চয়ই মনে থাকত।

পরে গোবিন্দের আরও অনেক প্রশংসা শুনেছিলেন বিমলেন্দু। শুধু পরিবেশনের কাজেই নয়, বাজার করা, মোট বওয়া, গাড়ি চালানো, লরি চালানো সব কাজেই ওর নাকি দক্ষতা আছে। বিয়ের দিন রাত্রে বাড়ির সব আলো হঠাৎ নিবে একেবার অন্ধকার হয়ে গেল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এসে পৌঁছবার আগেই গোবিন্দ সব আলো জ্বেলে ফেলল। ছেলেটি যে কাজের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কথায় কথায় বিমলেন্দু ছোট ভাইকে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই এই রত্নটি কোত্থেকে জোগাড় করলি বল তো?'

অমলও হাসল, 'ওর পেডিগ্রী সঠিকভাবে জোগাড় করতে

পারিনি দাদা। যতটা শুনেছি ছেলেবেলায় অনাথ আশ্রমে কেটেছে। বাপ-মার নামও বলতে পারে না, হয়ত বলতে চায় না। এক হিসেবে এখনও অনাথ। ওর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, থাকবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। কোন জীবিকাও নেই। যারা বিশ্বকর্মা হয়, তাদের কোন কাজ পছন্দ হয় না, কোন কাজ জোটেও না।'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'এদিক থেকে আমার মত অকর্মার সঙ্গে তো ওর খুব মিল আছে।'

হঠাৎ জয়ন্তী পিছন থেকে বলল, 'সত্যি বলছ কাকু, ওর কেউ নেই।'

অমলকে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ দেওয়ার জন্যে জয়ন্তী এসে দাঁড়িয়েছিল। ও যে চুপে চুপে সব কথা শুনেছে তা বিমলেন্দুরা কেউ টের পাননি। অমল হেসে জয়ন্তীর হাত থেকে সরবতের গ্লাসটি তুলে নিয়ে বলল, 'আপাতত আমরা আছি। দলের ছেলেরা ওকে খুব ভালবাসে। ওর প্রকাণ্ড চেহারাটা নিয়ে কেউ কেউ একটু ঠাট্টা-তামাসা করে বটে—'

জয়ন্তী হঠাৎ বলে ফেললে, 'ঠাট্টা করবার কি আছে কাকু? ওঁর চেহারাই তো সবচেয়ে পুরুষের মত চেহারা। ওঁর কাছে আর সবাই তো মর্কট।'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'উঁহু, অমন করে গাল দিও না। তাহলে তোমার বাবা-কাকাও বাদ যাবেন না।'

জয়ন্তী লজ্জিত হয়ে বলল, 'বাঃ রে, আমি কি তোমাদের

কথা বলেছি, আমি বলেছি কাকুর দলের ছেলেদের কথা।'

বিমলেন্দু ভাবলেন, নিজের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের জন্যে তাঁর মেয়ে এতদিন লজ্জিত ছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করেছে, ক্লাসের দিদিমণিরা ঠাট্টা করেছে। কতদিন জয়ন্তী এসে তাঁর কাছে নালিশ করেছে, 'আমি আর স্কুলে যাব না বাবা। আমি ভয়ঙ্কর বড় হয়ে গেছি। থার্ডক্লাসে সব ফ্রকপরা মেয়ে আসে। আমাকে নাকি কলেজে পড়লেই মানায়। আমার স্কুলে যেতে লজ্জা করে।'

কখনো ধমকে, কখনো অনুরোধ-উপরোধ করে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েছেন বিমলেন্দু। আজ আর দীর্ঘতার জন্যে লজ্জা নেই জয়ন্তীর। দীর্ঘতর একটি মানুষকে দেখে তার মনে গর্ব আর স্বস্তির ভাব এসেছে। নিজের মনেই হাসলেন বিমলেন্দু।

খালি গ্লাসটা ফেরৎ নিতে নিতে হঠাৎ জয়ন্তী বলল, 'আচ্ছা কাকু, এই তুমি বললে, গোবিন্দবাবুর কোন থাকবার জায়গা নেই। তোমার বৈঠকখানায় ওঁর থাকবার জায়গা করে দাও না।'

বিমলেন্দুর মনে হ'ল, অন্য কোন ছেলে সম্বন্ধে বাবা-কাকার কাছে এত কথা বলতে নিশ্চয়ই জয়ন্তীর সংকোচ হ'ত। এমন সুপারিশ ও কিছুতেই করতে পারত না। কিন্তু গোবিন্দ তো ওর কাছে সেই মুহূর্তে শুধু একটি যুবক ছেলে নয়, প্রকাণ্ড এক দর্শনীয় জন্তু। আগে যেমন রাজরাজড়াদের দুয়ারে হাতী বাঁধা থাকত, তাঁর জয়ন্তী রাণীরও হয়তো তেমনি হাতী বাঁধবার শখ হয়েছে।

অমল হেসে বলল, 'আমার দয়াময়ীর কথা শুনেছ? আমিও একবার ভেবেছিলাম ওকে রেখে দিই। জবরদস্ত একজন দারোয়ান হবে। কিন্তু ওর ওপর যদি বেশি পক্ষপাত দেখাই অন্য ওয়ার্কাররা কিছু ভাবতে পারে। তাদের মধ্যেও তো কত নিরন্ন আর নিরাশ্রয় রয়েছে। কজনকে আমি আর বৈঠকখানায় জায়গা দেব? আমাদের অফিসে কয়েকজনের কাজ জুটিয়ে দিয়েছি। আরো দু-একজনের জন্যে চেষ্টা করছি। তাছাড়া ওর যা হাতীর খোরাক।' অমল ফের একটু হাসল।

জয়ন্তীও হেসে ফেলল, 'সত্যি গোবিন্দবাবু খুব খেতে পারেন। আমি কাল পরিবেশন করেছিলাম। ওঁকে খাওয়াতে খুব ভালো লাগে। বাজি রেখে আধ ঝাঁকা লুচি আর প্রায় এক বালতি দই খেয়ে ফেললেন। আমি বলেছি একদিন রান্না করে খাওয়াব। উনি নাকি একটা পাঁঠা একা খাবেন।'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'তুই রাঁধতে জানিস, না কি কাঁচা মাংসই পাতে দিবি?'

জয়ন্তী বললে, 'বাঃ রে, জান না বুঝি, ঠাকুরমার কাছে আমি অনেক রান্না শিখেছি। তোমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব।'

অমল হাসল, 'তোর খেলাঘরের রান্না সেদিন পর্যন্ত আমাকে খেতে হয়েছে। নিজের হাতে আমার মুখে যত রাজ্যের রাবিশ গুঁজে দিয়েছিলি। নইলে তোর মন ওঠেনি। ঘণ্টাখানেক করে সময় লাগত আমার মুখ পরিষ্কার করতে।'

জয়ন্তী হেসে বলল, 'তাই বুঝি? ওসব না খেলে তোমার যে পেট ভরতো না। তুমি নিজেই তো চেয়ে চেয়ে খেতে। আমার সব মনে আছে। এবার আর খেলা নয়, সত্যিকারের রান্নাই তোমাদের খাওয়াব। মা যে বিশ্বাস করে আমার হাতে কিছু ছেড়ে দেয় না।'

জ্যোৎস্না আর সঞ্জয় ফের এল দেখা করতে। মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় সেকেলে সন্তান-বৎসল বাপের মতই বিমলেন্দুর চোখে জল এসেছিল, আশীর্বাদ করতে গিয়ে বুজে এসেছিল গলা। বাবা-মা সামনে দাঁড়িয়ে। অতিকষ্টে সেই লজ্জা অবস্থার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন বিমলেন্দু। কিন্তু আড়ালে এসে চোখের জল আর চক্ষুলজ্জা মানেনি। অথচ এই তো এখান থেকে ওখানে। টালিগঞ্জ থেকে যাদবপুর। টুনু-রুনুর মত দূরে শ্বশুরবাড়ি নয়। ইচ্ছা করলে রোজ দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে, কি টেলিফোনে কথা বলে গলার স্বর শোনা যায়। তবু মনে হয়েছিল, কতদূরেই না যেন চলে যাচ্ছে তাঁর খুকু। ভিন্ন পরিবার, ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন স্বার্থ। পর হয়ে যাচ্ছে বৈকি। কিন্তু ওর এই স্বাভাবিক শুভযাত্রায় যদি বাধা দিতেন তাহলেই বরং স্বার্থপর হতেন বিমলেন্দু। কিন্তু স্বার্থকে অত সহজে যেন ভোলা যায় না। নিজের অঙ্গচ্ছেদ যেন অত তাড়াতাড়ি সহ্য করা যায় না। দান করবার পরেও অবুঝ মন

বলতে চায় কেন দিলাম, কেন দিলাম ? নিজের শ্বশুরের কথা মনে পড়ল বিমলেন্দুর। তিনি এখন আর বেঁচে নেই। তাঁর স্নেহ আর প্রসন্ন দাক্ষিণ্য পেতে বিমলেন্দুর যথেষ্ট সময় লেগেছিল। দানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণা ক-জন দিতে পারে ? শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্ক প্রায়ই বিরোধের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর শ্বশুর মাঝে মাঝে হেসে বলতেন, 'জন-জামাই-ভাগনা, তিন নয় আপনা। জামাই আবার আপন হয় কবে ? দৌহিত্র আপন, কিন্তু জামাই পর।'

তখন এসব কথার মানে বুঝতেন না বিমলেন্দু, এখন বোঝেন। এমন এক সময় ছিল যখন শ্বশুরকুল থেকে কন্যাকে কেড়ে নিতে হ'ত, দস্যুর মত হরণ করতে হ'ত। এখন জামাইকেই বরণ করে নেওয়া হয়, তার হাতে উদারভাবে সালঙ্কারা কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। তবু বাপের মনে কখনো কখনো কোথায় যেন একটু অনুদারতা থেকে যায়। অবশ্য পণ-যৌতুকের প্রথা একটা বড় কারণ। বর কন্যা বরণ করে না, কিন্তু অর্থ হরণ করে। বিমলেন্দু ভাবেন, এই প্রথা যখন একেবারে বিলুপ্ত হবে, যখন কোন জামাইবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাবার দায় থাকবে না, শুধু তল্লাস নিলেই চলবে, তখন শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্ক আরও হৃদ্যতাপূর্ণ হবে। বিমলেন্দুর মনে হয়, বাপের অবুঝ মনে দত্তাপহারী হবার ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাই তিনি জামাইয়ের নানারকম খুঁৎ ধরেন, প্রসন্ন মনে তাকে গ্রহণ করতে পারেন না, তাকে আপন ভাবতে পারেন না, তাকে যমের সঙ্গে তুলনা

করেন। আর জামাই তা টের পায়। সেও হিংস্র বর্বর হয়ে ওঠে। শ্বশুর যে তার স্ত্রীরই বাপ একথা সে ভুলে যায়। তখন মেয়ের ওপর অধিকার অনধিকারের অংশ, তার আসা-যাওয়া, দেওয়া-নেওয়া নিয়ে মান-অভিমান বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই থাকে। বিবাহিতা নারী যেন দ্বিখণ্ডিতা। তার একখণ্ড পিতৃকুলে আর একখণ্ড স্বামীর কুলে। এই দুই খণ্ডকে জুড়ে অখণ্ডতার সাধনা তিনজনের। বাপ মেয়ে আর তার স্বামীর। বিমলেন্দু ভাবলেন, যদিও মেয়ের অকাল বিয়েতে তিনি অন্তর থেকে সায় দেননি, যদিও পণ কম নিয়েও সঞ্জয়ের বাবা যৌতুকের বৈচিত্র্যে আর পরিমাণে বিমলেন্দুর হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করিয়ে ছেড়েছেন, তবু প্রথম থেকেই জামাইয়ের সঙ্গে তিনি উদার ব্যবহার করবেন। তিনি সঞ্জয়কে ডেকে আলাপ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আলাপ তেমন জমল না। ছেলেটি বড় লাজুক। তিনি নিজেও তো কম লাজুক নন। একটু বাদে সে উঠে গেল। জয়ন্তী তার দিদিকে টানতে টানতে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল। 'দেখ বাবা, ওর এমনি লজ্জা যে তোমার সামনে আসতে পারে না।'

বিমলেন্দু স্নিগ্ধ হেসে ছোট মেয়েকে বললেন, 'দুষ্টু!' বড় মেয়েকে বললেন, 'লজ্জা কিসের।'

জ্যোৎস্না নত হয়ে টেবিলের তলায় হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। বিমলেন্দু লক্ষ্য করলেন, ওর সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের ছাপ, লক্ষ্য করলেন, হাতে একরকম চুড়ির সঙ্গে

এক গাছি করে শাঁখা। কোন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। মনে হ'ল, শুধু সৌভাগ্যের চিহ্ন নয়, আর একজনের সম্ভোগের চিহ্ন তাঁর মেয়ে এবার ধারণ করে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-টাকে তিনি মন থেকে মুছে ফেললেন। হেসে বললেন, 'কেমন আছিস খুকি?'

মেয়ে হেসে বলল, 'ভালো আছি বাবা।'

জয়ন্তী টিপ্পনী কাটলে, 'ওর শ্বশুরবাড়ির কথা জিজ্ঞেস কর বাবা।'

জ্যোৎস্না জোড়া ভ্রূ কুঁচকে বোনকে নিঃশব্দে শাসন করল। আর সেই ভ্রূকুঞ্চন দেখে বিমলেন্দুর একটি শ্লোকের চরণ মনে পড়ে গেল। 'ভবানী ভ্রূকুটির্ভঙ্গিঃ ভবর্বেত্তি ন ভূধরঃ।'ওর ভ্রূকুঞ্চনের পূর্ণ-অর্থ এখন আর একজন বুঝবে—তাঁর আর বোধগম্য হবে না। ইন্দিরার বাবা তাঁর মেয়েকে কতটুকু বুঝেছেন চিনেছেন, তিনি যতখানি চেনেন? মনে মনে হাসছেন বিমলেন্দু। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিও কি এই রকম? তার পরিপূর্ণ রসোপভোগ স্রষ্টার নয়, তোমার। কিন্তু যে সে তোমার নয়, যে শিল্পীর মানসকন্যাকে শুধু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে কি নানা ছলায় কলায় বারেকের জন্যে স্পর্শ করে, কি যে বর্বরের মত ধর্ষণ করে, শিল্পীর মানসকন্যা সেই হৃদয়হীন অরসিকের জন্যে নয়। দয়িতার রসমাধুর্যকে উপভোগ করতে হলে শুধু পাণিগ্রহণ করলে চলবে না। হৃদয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হবে। তবে সেই অপরূপ ভ্রূভঙ্গির ব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম হবে,

নইলে ভ্রূর মধ্যে কতকগুলি রোম ছাড়া কিছুই আর চোখে পড়বে না।

বিমলেন্দু চোখ তুলে দেখলেন, তাঁকে অন্যমনস্ক দেখে তাঁর দুই মেয়ে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে।

তারপর বছর খানেক মোটামুটি ভালোই কাটল। অফিসের কাজে আরো মন দিলেন বিমলেন্দু। নোট বই আর ইয়ারবুকের ফর্মার সংখ্যা বাড়তে লাগল। ইন্দিরা বলেছিল, 'ঠাকুরপো স্পষ্ট করে কিছু বলে না, কিন্তু খুকুর বিয়েতে বেশ দেনা হয়েছে। তুমি সব দেনা ওর ঘাড়ে ফেলে রেখো না। নিজেও কষ্ট করে কিছু শোধ কর। রোজগার বাড়াও।'

বিমলেন্দু অফিসের কাজে একনিষ্ঠ আর সময়নিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন। তা দেখে সহকর্মীরা বললেন, 'ব্যাপার কি বিমলবাবু, হঠাৎ আপনার মধ্যে নতুন এনার্জি এল কি করে? নতুন করে প্রেমেটেমে পড়লেন নাকি?'

বিমলেন্দু একখানা ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি লাল কালির কলম দিয়ে শুধরে দিচ্ছিলেন। বইখানা একজন নামকরা অধ্যাপকের নামেই বেরোবে। কিন্তু লেখাটি কোন তরুণ ছাত্রের। কলম বন্ধ করে তিনি হেসে সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পতন-টতনের আর কি বয়স আছে?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আরে মশাই, নিপাতনে সিদ্ধি বলেও তো একটা কথা আছে। তাছাড়া বয়সের দোহাই দেওয়া

আপনার সাজে না। এসব ব্যাপারে বয়সটাই একমাত্র গণ্য নয়। আমার তো মনে হয় সব বয়সেই নতুন করে প্রেমে পড়া দরকার। নইলে পৃথিবীটা বড় পুরনো হয়ে যায়, তার বর্ণগন্ধ টের পাওয়া যায় না। যতদিন জীবন ততদিন প্রেম, যতদিন উত্থান ততদিন পতন। তবে হ্যাঁ, পতনের ধরণটা আপনাকে বারবার পালটে নিতে হবে।' শশাঙ্কবাবুর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রলোক বেশ রসিক।

তাঁর পাশেই বসেন প্রুফ-রীডার প্রমথ মৈত্র। তাঁর মাথার চুল সব পাকা। বয়েস ষাট দাঁড়িয়েছে। তিনি হেসে বললেন, 'কিভাবে পালটাবেন বলুন তো? কোন বয়েসে চিৎপাত, আর কোন বয়েসে বুঝি শুধু হোঁচট? কিন্তু পতনের মাত্র একটিই অর্থ আছে। একেবারে অধঃপতন। সামলে চলতে না পারলেই গেলেন আর কি। আমাদের বিমলবাবু অত কাঁচা লোক নন। উনি এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এখন আর এক মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে টাকা জমাচ্ছেন। রীতিমত পাকা বুদ্ধির মানুষ।'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'তাই নাকি বিমলবাবু? ছোট মেয়েরও বিয়ে দিচ্ছেন নাকি?'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'না শশাঙ্কবাবু, বিনয়বাবুর কথা শুনবেন না। আমার ছোট মেয়ের বিয়ের এখনো অনেক দেরি। ওকে আমি এম-এ পর্যন্ত পড়াব। তারপর বলব নিজে দেখে-শুনে পছন্দ করে বিয়ে করো।'

বিনয় সেন বললেন, 'এম-এ পাশের ওপর তো অপনার খুব আস্থা দেখছি। এম-এ পাশ করলেই বুঝি সব বিছাবুদ্ধি দখলে আসে। অমন কাজও করবেন না বিমলবাবু। এম-এ পাশ করাতে চান করান, কিন্তু বিয়েটা নিজেই দেখেশুনে দেবেন। অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের ওপর পছন্দের ভার দিলে কি হয় জানেন? তারা একদিক দেখে তো তিনদিক দেখে না। অনেক সময় এমনও হয়, দেখেশুনে পছন্দ ঠিকই করল, কিন্তু বিয়ে করল না। ওসব ঝুঁকির মধ্যে যাবেন না মশাই, তার চেয়ে নিজে ছেলে পছন্দ করে সবদিক খোঁজখবর নিয়ে ঢুলি পুরুত ধোপা নাপিত শালগ্রাম আর অগ্নি সাক্ষী রেখে মেয়ের বিয়ে দেবেন—সেই ঢের ভালো। অনেক নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।'

বিমলেন্দু এ-কথার কোন জবাব দিলেন না, প্রতিবাদও করলেন না। ও ধরণের কথা তাঁর বাবাও বলে থাকেন। কিন্তু বিমলেন্দুর ওই পুরনো ধরণের বিয়েতে রুচি নেই। ছেলে-মেয়ে নিজেরা মেলামেশা করবে, দীর্ঘদিন ধরে একজন আর একজনের মনকে বুঝবে, স্বভাবকে চিনবে, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গির, আদর্শের মিল আছে কিনা দেখে নেবে, তারপর পরস্পরকে বিয়ে করবে। সে বিয়েতে জাতিভেদ থাকবে না, শুধু শিক্ষা সংস্কৃতি আর রুচির মিলই সেখানে যথেষ্ট। হয়তো এক্ষেত্রে ভুল হবে, অনেক ভুল হবে। কিন্তু ভুল সংশোধনের উপায়ও থাকবে। জীবনের সঙ্গী কি সঙ্গিনী বদলানো তখন সমাজে অশ্রদ্ধা পাবে না, এখন যেমন পায়। এখনও যে

সব দেশে, যে সব সমাজে ডাইভোর্স বিধিসম্মত, সে সব দেশেও ঠিক রুচিসম্মত কি সম্মানিত নয়।

এই নিয়ে অমলেন্দুর সঙ্গে তাঁর অনেকদিন তর্ক হয়েছে। সে বলে, 'দাদা, তুমি যে সব কথা বলছ তা একটি সম্পূর্ণ শিক্ষিত আর সমৃদ্ধ সমাজেই সম্ভব। আমাদের দেশে এখনও সেই সমাজ গড়ে ওঠেনি, আমাদের দেশে এখনও সেই কাল আসেনি। এখনও নারী-পুরুষের সমানাধিকার নভেলের পাতায় যতখানি যায়গা জুড়ে রয়েছে, বাস্তব জীবনে তার সিকির সিকিও দখল করেনি। এখনো চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস, ছদ্মবেশী ভদ্রবেশীর হাত থেকে মেয়েদের আত্মরক্ষা করে চলতে হয়। তাদের ঘোমটা খসেছে, কিন্তু ভিতরকার সেই ভয় ঘোচেনি। এখনো তারা মনে মনে বর্ম আর বাঘনখ পরে বের হয়, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে না। পথেঘাটে আমি যখন তাদের দেখি, তারা যেমন ষ্টিফ তেমনি আড়ষ্ট তেমনি অভদ্র মনে হয়।'

বিমলেন্দু বলেন, 'তার কারণ তো আমরা।'

অমলেন্দু হেসে বলে, 'সে কথা স্বীকার কর তাহলে। এখনো সেই দিন সেই সমাজ আসেনি। মেয়েরা সহজভাবে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ভয় পায়। পাছে আড়ালে আবডালে আচমকা কেউ প্রেম নিবেদন করে বসে। পাছে সেই আবেদন গ্রহণ করে শেষে পস্তাতে হয়। এখনো সমবয়সী দুটি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখলে পাড়ার

আর পাঁচজনে চোখ-টেপাটেপি গা-টেপাটেপি করে। গুজগুজ ফিসফিসানির অন্ত থাকে না। তারপর নিন্দার ভয় আছে, জাত যাওয়ার ভয় আছে। যদি কোন কারণে সেই দুটি ছেলে-মেয়ের সৌহৃদ্য ভেঙে গেল, মেয়েটির বিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে।'

বিমলেন্দু মনে মনে ভাবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য ছেলেটির বিয়ে দিতেই বেগ পেতে হচ্ছে।

অমলেন্দু বলে, 'আসলে বিবাহ-বিধি তুমি যতই পালটাও না কেন, সে প্রগতি তোমার আইনের বইতে আর গল্প-উপন্যাসেই আটকে থাকবে, সমাজ তা ব্যাপকভাবে নেবে না, যেমন বিধবা-বিবাহকে নেয়নি। তাছাড়া শুধু বিবাহ-বিধি বদলে কোন লাভ নেই, বদলাতে হলে তোমার মূল থেকে বদলাতে হবে। আর্থিক কাঠামোটা ওলটপালট করে ফেলতে হবে। শুধু বাসর ঘরখানা সুন্দর করে তুললে, আর তা নিয়ে কবিতা লিখলে তাতে কিছু হবে না। তুমি বেকার সমস্যা ঘোচাও, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককে পছন্দ মত কাজ বেছে নিতে দাও, সেই কাজের জন্যে ভদ্ররকমের মজুরী দাও, না খেয়ে মরবার ভয় দূর কর, তারপর সমাজের সর্বস্তরে উদার অকৃপণভাবে শিক্ষাকে ছড়াও—দেখবে sex-সংক্রান্ত যে সব কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে তা আপনিই ঝরে পড়বে।'

বিমলেন্দু অমলের সঙ্গে কথায় পারেন না। বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে ও জিভকে ধারালো আর গলাকে উদাত্ত করেছে। তিনি

স্বীকার করেন ওর কথাগুলি ঠিক। তবে রাতারাতি ওসব হবে না। হাতাহাতিটা অযৌক্তিক বলে এখন সবাই প্রায় স্বীকার করে নিয়েছি। যদিও আস্তিন গুটানোর ভাবটা সব সময়ই রয়েছে। কি বড় ক্ষেত্রে কি ছোট ক্ষেত্রে। তবু সমাজের যে কোন রকমের যে কোন দিকের সংস্কারই বিমলেন্দু নিরর্থক মনে করেন না। মুণ্ড শুদ্ধ যখন কেটে আনা যাবে না, তখন কান টেনেই মাথা আনতে হবে।

কিছুদিন বেশ শান্তিতে নির্বিবাদে কাটল। নিজের ভাব-লোকে নিজের পড়াশুনো নিয়ে মগ্ন হয়ে রইলেন বিমলেন্দু। তারপর আবার তাঁকে ভেসে উঠতে হ'ল, জেগে উঠতে হ'ল। কারণ তখন অশান্তি সুরু হয়ে গেছে। জয়ন্তীকে নিয়েই অশান্তি। কিছুদিন ধরে একটা চাপা ফিসফিসানির শাসন, তিরস্কার, বাদ-প্রতিবাদের শব্দ তাঁর কানে আসছিল। তিনি মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ডেকে বলেন, 'ব্যাপারটা কী? হয়েছে কী তোমাদের?'

ইন্দিরা বলেছে, 'কিছুই হয়নি। এ আমাদের মেয়েদের ব্যাপার। তুমি যখন সংসারের কোন কিছুতে থাক না, এর মধ্যেও তোমাকে আসতে হবে না।'

বিমলেন্দু অপ্রসন্ন এমন কি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, 'বেশ তো, না আসতে হলেই ভালো।'

কিন্তু স্ত্রী না বললেও মেয়ে এসে বলল। মানে বড় মেয়ে।

তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। বোধ হয় ছেলেপুলে হবে। ইন্দিরা তাকে মাসখানেকের জন্যে আনিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্না তাঁর টেবিল গুছিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ বলল, 'বাবা, তোমার কাছে একটা নালিশ আছে।'

বিমলেন্দু হেসে বললেন, 'কার নামে? তোর শাশুড়ীর নামে তো?'

জ্যোৎস্না প্রতিবাদ করে বলল, 'মোটেই না। তুমি বুঝি ভাব, মা আর ঠাকুরমা যেমন ঝগড়া করে, আমিও আমার শাশুড়ীর সঙ্গে তেমনি ঝগড়া সুরু করে দিয়েছি।'

বিমলেন্দু বললেন, 'এখনও হয়তো শুরু করিসনি, আর বছর খানেক পরে করবি।'

জ্যোৎস্না বলল, 'মোটেই না। আজকালকার মেয়েরা তাদের শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে না। তোমাদের সে আমল আর নেই।

বিমলেন্দু হাসিমুখে বললেন, 'বটে, আগেকার বউরা ঝগড়ার পরে আলাদা হয়ে যেত, এখনকার বউরা অনেক বুদ্ধিমতী, ঝগড়ার আগেই আলাদা হয়। এখন শাশুড়ী-বউএ জায়ে-জায়ে ঝগড়ার মাত্রাটা কমেছে। কারণ পাশাপাশি বাস না করলে মুখোমুখি ঝগড়ার সুযোগ হয় না।'

জ্যোৎস্না বললে, 'বাবা তুমিও এবার ঠাকুরদার মত কথা বলতে সুরু করেছ। তুমিও কি তাঁরই মত সেকালের সুখ্যাতি আর একালের নিন্দা করবে?'

একথায় বিমলেন্দু যেন একটু চমকে উঠলেন। তিনিও কি সেকেলে হয়ে গেলেন ? তা হবে। মানুষ তার যৌবনে আধুনিক, বার্ধক্যে পৌরাণিক। আধুনিকতা আর অনাধুনিকতা অনেক ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক। মানুষ তার যৌবনের ধ্যান-ধারণা নিয়ে চলতে চলতে পুত্র-পৌত্রদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ধাক্কা খায়। সে নিজেকে আধুনিক ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না, নিজের মত-টাকেই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত আর বৈজ্ঞানিক বলে মনে করে। কিন্তু তার ছেলে, তার উত্তরপুরুষ তা কিছুতেই স্বীকার করে না। সে তার পূর্বপুরুষকে বাতিল করে দেবেই দেবে। এমনি করেই কাল এগোয়। সময় বদলায়।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন বিমলেন্দু। বিয়ের পর তাঁর মেয়ের সাহস বেড়েছে, সংকোচ কমেছে। এক বছরের মধ্যে সে যেন সংসারের সব কিছু বুঝে ফেলেছে—এমনি একটা আত্মপ্রত্যয় এসেছে তার মধ্যে। সে এখন তাঁর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারে। বলতে নেই গায়েও বেড়েছে জ্যোৎস্না। আরও একটু লম্বা হয়েছে। কিন্তু পড়াশুনোটা আর বোধ হয় হ'ল না। স্বামীর কাছে নাকি প্রাইভেট পড়ছে। বিমলেন্দু জানেন অমন পঠন-পাঠনে বাইরে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায় না।

তিনি ফের জ্যোৎস্নার গলা শুনতে পেলেন, 'তুমি যা ভাবছ তা নয় বাবা। নালিশটা আমার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নয়।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তবে কি বাপের বাড়ির বিরুদ্ধে ?

তাহলে নির্ভয়ে বল। 'এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর করে বলতে থাক।'

জ্যোৎস্না চেয়ারটা টেনে বসল। তারপর একটু হেসে বলল, 'এক নম্বর নালিশ তোমার বিরুদ্ধেই বাবা।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তাই নাকি, এতদিন ও ব্যাপারটা তোদের মারই 'মনোপলি' ছিল, এবার তোরাও শুরু করলি!'

জ্যোৎস্না একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'তুমি জয়ন্তীকে মোটেই শাসন করছ না বাবা।'

বিমলেন্দু বললেন, 'সে কি, ওকে শাসন করবার জন্যে এ বাড়িতে মানুষের অভাব আছে নাকি? তোমার মা রয়েছেন, আমার মা রয়েছেন।'

জ্যোৎস্না পাকা গৃহিণীর মত বলল, কিন্তু বাবা তোমার দায়িত্ব তুমি অস্বীকার করতে পার না। যদি খারাপ কিছু হয়, সবচেয়ে বেশি ভুগতে হবে তোমাকেই।

বিমলেন্দু একটু হেসে বললেন, 'Threatning তো খুব দিচ্ছিস, ব্যাপারটা কি হয়েছে তাই আগে বল!'

জ্যোৎস্না একটু আরক্ত মুখে বলল, 'হাসবার কথা নয় বাবা। জয়ন্তীটা গোবিন্দবাবুর সঙ্গে বড় বেশি মেশামেশি করছে।'

বিমলেন্দু এবার আরও জোরে হেসে উঠলেন, 'মানে জয়ন্তীটা জন্তুটার সঙ্গে মেশামিশি করছে!'

তারপর হাসি চেপে বললেন, 'ওই এক ফোঁটা মেয়ে, ওর

সঙ্গে মিশে কি করবে। ও তো একটা হাতী।'

জ্যোৎস্না বলল, 'তোমার মেয়েও ছোট নয় বাবা। তুমি ওকে যতটা ছোট ভাবছ তা মোটেই নয় ও। ও তোমার কাছেই কেবল খুকি সেজে থাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও বড্ড পেকে গেছে।'

বিমলেন্দু এবার একটু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোরাই কাঁঠাল কিলিয়ে পাকাচ্ছিস।'

জ্যোৎস্না এবার রাগ করে উঠে গেল। যাওয়ার সময় বলল, 'মা ঠিকই বলে, তুমিই ওকে বেশি আস্কারা দিচ্ছ।'

বড় মেয়ের এই রূঢ়তা বিমলেন্দুর ভালো লাগল না। তাঁর মনে হ'ল মেয়ে মাত্রেই রক্ষণশীল। বেশীর ভাগ মেয়েই অন্য একটি মেয়ে সম্বন্ধে অনুদার। সে মেয়ে মা, গিন্নী, বোন, বান্ধবী যাই হোক না কেন। রক্ষণশীলতাই মেয়েদের স্বভাব। তাদের ঘর-সংসার বাঁধবার জন্যে, স্থায়ী করে রাখবার জন্যে, সন্তান ধারণ আর পোষণের জন্যে এই রক্ষণশীলতা তাদের প্রয়োজন। পুরুষ সেই সুযোগ নিয়ে যত আচার-অনুষ্ঠান, কবচ-মাদুলী, যত কুসংস্কারের বোঝা ওদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। বলেছে, তোমরা গৃহলক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আসন বজায় রাখবার ভার তোমাদের ওপর। কিন্তু সেই লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে একটা পেঁচা এসে জুটেছে। যত কুশিক্ষা, অশিক্ষা, অনুদারতা, কুসংস্কারের জট মেয়েদের মনে এমন ভাবে পাকিয়ে গেছে যে তা আর ছাড়ানো সহজ নয়,

পুরুষ তাই স্বখাত সলিলে ডুবে মরছে। তার ঘরের সংকীর্ণতা অনুদারতা তাকেই পাকে পাকে জড়াচ্ছে।

জয়ন্তী যে গোবিন্দের সঙ্গে মেশে তা তিনিও লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু তাতে আপত্তির কিছু দেখতে পাননি। জ্যোৎস্নার সেই বিয়ের দিন থেকে গোবিন্দের এ বাড়িতে সমাদর বেড়ে গেছে। বিমলেন্দু তো কিছু কিছু না দেখেছেন তা নয়। কারণে অকারণে তাকে প্রায়ই ডেকে পাঠানো হয়েছে। সিনেমার টিকেট আনতে হবে, যাও গোবিন্দ। জামাইবাড়িতে কিছু একটা খবর পাঠানো দরকার, যাও গোবিন্দ। হাসপাতালে মার চোখ দেখাতে হবে, গোবিন্দকে সঙ্গে নিলে ভালো হয়। তবে সেই সঙ্গে বাড়ির কেউ গেলে আরো ভালো। জয়ন্তীর স্কুলের ছুটি থাকলে সেও গেছে। এই তো ব্যাপার। আর কী করেছে জয়ন্তী? গোবিন্দ যখন তার বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়েছে, জয়ন্তী সব চেয়ে বড় কাপটায় করে চা নিয়ে গেছে। ওর খাওয়া দেখবে। বৃহতেই ওর আনন্দ। এ আনন্দ কি কেবল জয়ন্তীর একার? ওই বয়েসী পাড়ার আরও দশটি স্কুলের ছেলেমেয়ের তো গোবিন্দের সেই বিশালতা দেখে আনন্দ পেয়েছে। একদিন যেতে যেতে বিমলেন্দু শুনছিলেন, 'গোবিন্দদা, তোমার চেহারাটা তো হাতীর মত। আমি যদি তোমার পিঠে চড়ে বসি, তুমি আমাকে নিয়ে হাঁটতে পার?'

গোবিন্দ হেসে বলেছিল, 'তোমার মত দশটাকে নিয়ে পারি।'

জয়ন্তীও খুশি হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, 'গোবিন্দদা, আমাকে নিয়ে পারেন ?'

বিমলেন্দুর মা ধমকাতে এসেছিলেন, 'তুই আবার ওখানে গেলি কেন ওই রাস্তার মধ্যে ? তোর কি লজ্জা-সরম বলে কিছু নেই ?'

ঠাকুরমার কথায় কান না দিয়ে জয়ন্তী ফের জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমাকে নিয়ে পারেন ?'

গোবিন্দ জবাব দিয়েছিল, 'না, তোমাকে নিয়ে পারিনে। তুমি এখন ওজনে ভারি হয়ে গেছ।'

জয়ন্তীর আহত মুখ দেখেছিলেন বিমলেন্দু, গোবিন্দের কথাটা সম্পূর্ণ নির্দোষ কি না ভাবতে ভাবতে ট্রাম ধরবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। খোঁচা যদি গোবিন্দ একটু দিয়েও থাকে, তার জন্যে তো বাড়ির সবাই দায়ী।

আর কোন ঘটনা দেখেছেন কি শুনেছেন কিনা বিমলেন্দু মনে আনতে যাচ্ছিলেন, জয়ন্তী এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল, 'বাবা!'

বিমলেন্দু চমকে উঠে মুখ তুললেন, 'কি রে!'

জয়ন্তী বলল, 'দিদি এসে তোমার কাছে আমার নামে কি লাগাচ্ছিল বাবা ?'

বিমলেন্দু মনে মনে হাসলেন, আড়ি পাতাটা মেয়েদের স্বভাব। ইন্দিরাও পাততো। বিমলেন্দু হেসে মেয়ের পিঠে হাত দিলেন, 'তুই শান্ত হয়ে বস তো এখানে। কী আবার লাগাবে ?'

জয়ন্তী বললে, 'হুঁ লাগিয়েছে। আমি জানলা দিয়ে দেখে গেলাম, দিদি তোমার কাছে বসে আমার বিরুদ্ধে কি যেন ফিস ফিস করছে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'ফিস ফিস করলেও তোর বিরুদ্ধে করতে যাবে কেন? তুই কি কোন দোষ করেছিস?'

তিনি স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন।

জয়ন্তী চোখ নামিয়ে বলল, 'আমি কেন দোষ করতে যাব? মিছিমিছি সবাই আমার বিরুদ্ধে লাগাতে আসছে কেন বল তো? গোবিন্দদার সঙ্গে কথা বলেছি তো কী দোষ হয়েছে? সেও তো মানুষ।'

বিমলেন্দু মনে মনে ভাবলেন, মানুষ বলেই তো আপত্তি, একেবারে বনমানুষ হলে কোন কথা উঠত না।

কিন্তু মেয়েকে শান্তভাবে উপদেশ দিলেন, 'ওরা যা বলেন, তোর ভালোর জন্যেই বলেন। তুই এখন বড় হয়েছিস। বেশ বুঝেশুঝে চলবি, বাজে সময় নষ্ট করা কি তোর সাজে? ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিস, এখন তোর বেশি পড়াশুনো করা দরকার। এরপর কলেজে পড়বি। তোর কি পড়াটড়া ফেলে—'

জয়ন্তী বললে, 'পড়াশুনো তো আমি ফেলে রাখিনে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'সেই সঙ্গে ওঁদের কথাও মেনে চলবি। তাহলে তোকে লোকে ভালো বলবে। ভালো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে—বুঝেছিস?'

সেইদিনই রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর কথা হ'ল। দুই মেয়ের সঙ্গে বিমলেন্দু যে আলাপ হয়েছে তার সবই তিনি স্ত্রীকে জানালেন। শেষে বললেন, 'জয়ন্তী বড় অভিমানী। এই বয়সে অভিমান একটু বেশিই হয়। রাগারাগি না করে বেশ নরমভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—'

ইন্দিরা বলল, 'আর বোঝাবার কিছু নেই। ও মেয়ের পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। ওকে এখন যত শিগগির পার বিয়ে দিয়ে দাও।'

বিমলেন্দু প্রতিবাদ করে বললে, 'কখনও না, আমি অন্ততঃ আরো ছ-সাত বছরের আগে ওর বিয়ে দিতে দেব না। ওর পড়াশুনোর ভার নিজে নেব।'

ইন্দিরা বলল, 'এতদিন সব নিয়ে উলটিয়ে দিয়েছ, আর বাকি আছে এখন পড়ানো! তাহলে শুনবে মেয়ের কীর্তি? ও গোবিন্দের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে দুদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। ট্যাকসি করে নাকি বেড়িয়েছে ও।'

বিমলেন্দু এবার একটু স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও ট্যাকসি চালায় নাকি?'

ইন্দিরা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি এত বাজে বকতেও পার! চালায় কি চালায় না তার আমি কি জানি? শুনেছি দু-একজন ড্রাইভারের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব আছে। তাদের গাড়িটাড়ি মাঝে মাঝে নিয়ে চালায়।'

বিমলেন্দু বললেন, 'জয়ন্তী বেরুল কি করে?'

ইন্দিরা বলল, 'একদিন দিদির বাড়ি যাবে বলে বেরিয়েছিল, আর একদিন বলেছিল, কোথায় কোন বন্ধুর জন্মদিন। ও এখন একটাও সত্যি কথা বলে না। চোখে-মুখে মিথ্যে কথা বলে। ওর কোন কথা আমি আর বিশ্বাস করিনে।'

বিমলেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তুমি এত সব কথা পেলে কোথায় ?'

ইন্দিরা বলল, 'পাব আবার কোথায়, গোবিন্দের দলের দুটি ছেলেই আমাকে বলেছে। তাদেরও চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। ঠাকুরপোর কানেও গেছে কথাটা। সেও সহজে ছেড়ে দেবে না। বলেছে, যাক, ষ্টেপ নেব।'

বিমলেন্দু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারলেন না। অত্যন্ত আঘাত লাগল মনে। জয়ন্তীর রুচির তিনি প্রশংসা করতে পারলেন না। ছি ছি ছি, তাঁর অমন সুন্দরী মেয়ে, একটা হোটেল-বেহারা সামান্য লেখাপড়া-জানা কুলশীল-হীন একটা ছেলেকে তাঁর মেয়ে পছন্দ করে বসল! ও কি ভালোবাসার আর লোক পেল না ? বিমলেন্দু অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন।

ক্লান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ইন্দিরা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। বিমলেন্দু আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'ল দোষ তাঁদেরই, জয়ন্তীকে যদি সহজভাবে ওর আরো পাঁচটি সমবয়সী ছেলের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হ'ত, ওকে আগের মতই ছুটোছুটি খেলাধুলো করতে দেওয়া হ'ত, তাহলে হয়তো এই

অদ্ভুত ধরণের পছন্দ ওর হ'ত না। গোবিন্দের হয়তো বিশেষ কোন একটা লক্ষণ ওর ভালো লেগেছে, নিশ্চয়ই মানসিক কোন গুণ নয়; হয়তো শারীরিক গড়নের কোন বৈশিষ্ট্য, হয়তো দৈর্ঘ্য, হয়তো শক্তি-সামর্থ, হয়তো উচ্চতা, প্রগলভতা ওর চোখে লেগে গেছে। আর হয়তো সামান্য একটু ভগ্নাংশকেই ও পূর্ণ আংশের মর্যাদা দিয়েছে। ও আর কোন দিকে দেখছে না, আর কোন দোষ ধরছে না। একটি দুটি গুণের জন্যেই ওকে একেবারে গুণবাণ ভেবে নিয়েছে। শুধু অল্প বয়েসে নয়, বেশি বয়সেও মানুষ এমন ভুল করে। কাম্য বস্তুকে কাম্য ব্যক্তিকে নিজের চোখের রঙে রাঙিয়ে নেয়। জয়ন্তীর এই ভুল ভেঙে দিতে হবে। তবে হাতুড়ি পিটিয়ে নয়, আস্তে আস্তে বুঝিয়ে শুনিয়ে।

কিন্তু ধীরে সুস্থে কিছু করবার সুযোগই পেলেন না বিমলেন্দু। ব্যাপারটার ভার গিয়ে পড়ল অমলের হাতে। সংসারের বেশির ভাগ ব্যাপারের ভারই তার ওপর। বিমলেন্দু বলেছিলেন, 'এ নিয়ে হৈ চৈ করে লাভ নেই। শুধু গোবিন্দকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দাও।'

অমল প্রথমে তাই করেছিল। ওকে দল থেকে বের করে দিয়ে বলেছিল, 'খবরদার, এমুখো আর হয়ো না।'

কিন্তু আকর্ষণ কি অত সহজে যায়? গোবিন্দ নিজে এল না। কিন্তু গোপনে এক চিঠি পাঠিয়ে দিল। অমলেন্দুর চর

সব জায়গায়। সে চিঠি জয়ন্তীর হাতে না গিয়ে অমলের হাতে গিয়ে পড়ল। এসব ব্যাপার বিমলেন্দু পরে শুনেছেন। তাঁর কাছে আগে কেউ কিছু বলেনি। বলবার দরকার মনে করেনি। এই কাণ্ডের কথা জানতে পারলেন, জয়ন্তী যখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে নালিশ করতে এল, 'জান বাবা, কি সর্বনাশ হয়েছে? 'গোবিন্দদাকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'যাঃ, অত বড় দৈত্যের মত একটা লোককে কেউ মেরে ফেলতে পারে?'

জয়ন্তী বলল, 'একজনে পারে না, কিন্তু পঁচিশজনে মিলে যদি একটা লোককে আক্রমণ করে, তার কি থাকে বল তো। না মারলেও তাকে ওরা আধমরা করে রেখে দিয়েছে। মহানির্বাণ রোডের একটা গ্যারেজের মধ্যে সে ধুঁকছে। আমি তাকে দেখতে যাব বাবা?'

বিমলেন্দুর বাবা হঠাৎ নিজের ঘর টপকে বেরোলেন, 'হ্যাঁ তা যাবে না? হতচ্ছাড়া পাপী মেয়ে, একথা আবার নিজের মুখে নিজের বাপের কাছে বলতে গেছে। যেমন বাপ, তেমনি তো তার মেয়ে হবে। এস, ভেতরের ঘরে এস।'

জয়ন্তী একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও দাদু, আমাকে কথা বলতে দাও। আমাকে যেতে দাও বাবা। আমি শুধু একবার দেখে আসব।'

বিমলেন্দু বললেন, 'ছিঃ, অমন গোঁয়ার্তুমি করে না। তুই এসব খবর পেলি কোথায়?'

জয়ন্তী বলল, 'আমি পেয়েছি। তার বন্ধুরাই এসে আমাকে গোপনে বলে গেছে।'

জয়ন্তী তখনই বেরিয়ে যায় আর কি, ইন্দিরা এসে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল ওর গালে—'হতভাগা বেহায়া মেয়ে, লজ্জা করে না? সে যদি সত্যিই মরে গিয়ে থাকে তো ল্যাঠা চুকে গেছে। চল, ভিতরে চল। আবার বাপের কাছে এই নিয়ে সোহাগ জানাতে যাওয়া হয়েছিল। যেমন বাপ—'

জ্যোৎস্না অনেক বলে কয়ে ছোট বোনকে ভিতরে নিয়ে গেল।

বিমলেন্দু গম্ভীরভাবে অমলের ঘরে ঢুকলেন। সে বেরুবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। বিমলেন্দু বললেন, 'অমল একটা কথা।'

অমল ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'বল।'

বিমলেন্দু বললেন, 'মারধোর করাটা তোমাদের সঙ্গত হয় নি। এতে কেলেঙ্কারি বাড়বে ছাড়া কমবে না।'

অমল অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'দাদা, এ ব্যাপারে তুমি কথা বলতে এসো না। সে আমার দলের ছেলে। আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। বহুবার ওয়ার্নিং দিয়ে দেখলাম, কিছুই হ'ল না, শেষে এই চরম ব্যবস্থা। এর মত আর ওষুধ নেই।

বিমলেন্দুর বাবা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এবার এগিয়ে এসে অমলের তারিফ করে বললেন, 'ঠিক বলেছিস বাবা, ঠিক বলেছিস, ওর তুল্য আর ওষুধ নেই।'

আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে বিমলেন্দুর মনে পড়ে গেল।

অনেক কালের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। খেয়াঘাটে মুখোসপরা ছাত্রদের হাতে গভীর রাত্রে তাঁর বাবাও একদিন মার খেয়েছিলেন। মাঝিরা ধরাধরি করে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল। সে কথা বোধ হয় আজ আর তাঁর মনে নেই। এই মুহূর্তে নেই অন্ততঃ। সম্ভবত অমলেরও নেই, মারও নেই। তাঁদের মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বাবার মুখখানা ঠিক তেমনি বেঁকে রয়েছে।

বিমলেন্দু ভাবলেন, মারই যদি একমাত্র ওষুধ হয়, বাবা কি তাতে শুধরেছেন? বরং সেই নিষ্ঠুর নির্মম প্রহারেই হয়তো সারাজীবন তাঁকে এখন মারমূর্তি করে রেখেছে। যে প্রতিশোধ তিনি ছাত্রদের ওপর নিতে পারেন নি, তাই সকলের ওপর নিচ্ছেন।

বিমলেন্দুর মনে হ'ল, তাঁর একবার গোবিন্দের খোঁজ নেওয়া উচিত। ঠিকানা কার কাছে পাবেন? অমলরা নিশ্চয়ই বলবে না। জয়ন্তীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে তাঁর যেন কেমন একটা সঙ্কোচ হ'ল। তাছাড়া সারা দিনরাত্রের মধ্যে জয়ন্তীকে তিনি একা পেলেন না। কখনও মা, কখনও ইন্দিরা, কখনও জ্যোৎস্না, কখনও বা বিমলেন্দুর বাবা তাকে পাহারা দিতে লাগলেন। কিন্তু বিমলেন্দু তো সৎকাজই করতে যাচ্ছিলেন। তাঁর আদর্শ মত নির্যাতিতের উপর সমবেদনা জানাতেন। তবে তা সাহসের সঙ্গে করতে পারলেন না কেন? নিজের সেই ভীরুতার হেতু বিমলেন্দু আজও খুঁজে পাননি। হয়তো লোক-

লজ্জা, লোকভয়, নিজের পরিবারের কাছে গঞ্জনার ভীতি।

তিনি অমলকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। তবু সে অনেক রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে বিমলেন্দুকে বলে গেল, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওকে মেরে ফেলাও হয়নি, তিরস্কারও করা হয়নি। দিনকয়েক হয়ত বিছানায় পড়ে থাকবে। তারপর আবার উঠবে। আমার ছেলেরাই গিয়ে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেছে। দয়ামায়াটা তোমার চেয়ে তাদের মনে কম নেই। তবে তারা শুধু দয়া দেখায় না। অন্যায় দেখলে শুধরেও দেয়।'

বিমলেন্দু চলে আসছিলেন, অমল তাকে ফের ডাকল, 'হ্যাঁ, জয়ন্তীর কথা এখন আর অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস কোরো না। নিজের সুবিধের জন্যেও আজকাল অনেক কথা বাড়িয়ে সাজিয়ে বলে। ওর সে গুণও হয়েছে। জান তো ওকেই আমি সব চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। আজ ওর মুখ দেখতে আমার ইচ্ছা করে না, নাম করতেও—'

মুখের ভঙ্গিতে ঘৃণার বিকৃতি এনে অমল চলে গেল।

বিমলেন্দুর মনে আছে, তারপর কিছুদিন খুব কঠিন পাহারায় রাখা হ'ল জয়ন্তীকে। কিছুদিনের জন্যে ওকে কোথাও বেরুতে দেওয়া হ'ল না। স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

বিমলেন্দু একবার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ওকে সময় মত খেতেটেতে দিচ্ছ তো?'

ইন্দিরা বলেছিল, 'না। না খাইয়ে রেখেছি। মেয়ে তো

আর আমার না, শুধু তোমার, তুমিই ওকে পেটে ধরেছ।' শেষ কথাটা একটু হেসেই বলেছিল ইন্দিরা।

সপ্তাহখানেক বাদে অবশ্য কঠোরতা কমলো। জয়ন্তীকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল স্কুলে যাওয়ার জন্যে। পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। এই সময় স্কুল কামাই করলে ক্ষতি। অমলই যাওয়ার অনুমতি দিল। একটি ঝি ঠিক করে দেওয়া হ'ল, ওকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আর নিয়ে আসার জন্যে।

তারপর বিমলেন্দু একদিন সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন—বাড়ির সবাইর মুখ গম্ভীর। ইন্দিরা ঘরের কোণে দেয়ালে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জ্যোৎস্না তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাবা গম্ভীর মুখে হুঁকো টানছেন। মা চুপচাপ বসে আছেন, যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে বাড়িতে। বিমলেন্দু তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে মা ?'

মা এসে অনেকদিন বাদে আজ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ওরে বাবা, সর্বনাশ হয়ে গেছে, তোর—তুই কি কিছুই বুঝতে পারছিসনে ?'

বিমলেন্দু বললেন, 'না। শঙ্কু-রঙ্কু কোথায় ?'

মা বললেন, 'তারা ভালোই আছে। সেই হতভাগী পালিয়েছে।

বাবা হুঁকোটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমাদের কাছেই চিঠি দিয়ে গেছেন, এই দেখ।'

পেনসিলে লেখা, ভাঁজ করা একখানা কাগজ তিনি বিমলেন্দুর হাতে দিলেন। তিনি খুলে পড়লেন কাগজখানা, 'বাবা, আমি চললাম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোর না। খুঁজলে পাবে না। ইতি জয়ন্তী।'

বিমলেন্দু কোন কথা বললেন না। শুধু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

অমল এলো আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। তাঁর হাত থেকে নিয়ে চিঠিখানা পড়ল। তারপর মাকেই জিজ্ঞাসা করল, 'এ চিঠি তোমরা কখন পেয়েছ?'

মা বললেন, 'বিকেল বেলা। আসলে স্কুলে যাওয়ার সময় চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল। ঝি এসে বলল, দিদিমণি আগেই চলে এসেছে। তখনই আমার সন্দেহ হ'ল ও আর আসবে না। ও কি অমু কোথায় চললি?'

অমল বলল, 'থানায়।'

মা ব্যাকুলভাবে বললেন, 'সে কি, হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর, চা-টা খা।'

বাবা সখেদে বললেন, 'গিয়ে আর লাভ কি বাবা। হাঁড়ি যদি একবার কুকুরে নেয়—'

অমল বাবাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, 'আপনি থামুন। তাতে হাঁড়ি অশুদ্ধ হয় না, কুকুরকে ধরেই ঠেঙাতে হয়। বংশের মেয়ে আর মাটির হাঁড়ি এক জিনিস নয়।'

যে পায়ে এসেছিল অমল, ঠিক সেই পায়েই ক্রুদ্ধ, দীপ্ত আহত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

জয়ন্তীরা পুলিশকে নাকে দড়ি দিয়ে বেশিদিন ঘোরাতে পারল না। ওর ডজনতিনেক ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া বিদ্যা এ ব্যাপারে কোন কাজেই এলো না। দিন তিনেক বাদে বউবাজারের এক হোটেল থেকে ওরা নিজেরাই এসে থানায় ধরা দিল। সেই সঙ্গে বলল, 'কালীঘাটে গিয়ে আমরা বিয়ে করেছি।'

অমল বলল, 'এই পুতুলের বিয়ে কে গ্রাহ্য করবে? মাথায় খানিকটা সিঁদুর লেপলেই বিয়ে হয়ে গেল? ও তো সবে ষোলয় পা দিয়েছে। সাবালিকা হতে এখনও পুরো দুবছর বাকি।'

থানার ও. সি. কিডন্যাপিং-এর চার্জে গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করে হাজতে ধরে রাখলেন। জয়ন্তীকে পাঠালেন সরকারী রেসকিউ হোমে। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই তাকে রাখতে হবে। বিমলেন্দুর ঘরেই পারিবারিক বৈঠক বসল। তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী, ভাই সবাই এসে হাজির হলেন। এ বিপদে কী করা উচিত তার পরামর্শের প্রয়োজন। এই সব গোলমালের কথা শুনে জ্যোৎস্নাকে তাঁর শ্বশুর এসে নিয়ে গেছেন। সে আর এখানে থাকে এমন ইচ্ছা কারোরই ছিল না।

আঘাতটা যত সহজে নিতে পারবেন বলে মনে করেছিলেন, বিমলেন্দু তা পারলেন না। দুদিনের মধ্যে অফিসে বেরোলেন না, যেন নড়াচড়াও কষ্ট। যেন সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হয়েছে। এই অবস্থায়, দীর্ঘদিন ধরে যাকে নিয়ে ঘর-সংসার করেছেন, যাকে বলিষ্ঠ সান্নিধ্য দিয়েছেন পেয়েছেন, সেই স্ত্রীই বিমলেন্দুকে মর্মান্তিক আঘাত দিল, 'নাও, মনের সাধ এবার মিটলো তো? নিজে ভালেবেসে বিয়ে করতে পারোনি, সেই দুঃখ তো মনে পুষে রেখেছিলে। এবার মেয়ে করল ভালোবেসে বিয়ে। হ'ল তো?'

অমলেন্দু সামনেই ছিল, সে ধমক দিয়ে উঠল, 'আঃ, কী করছ বউদি, থাম। এখন কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার সময়?'

ইন্দিরা বলল, 'তুমি জানো না ঠাকুরপো, ওঁর আদর আমাদেরই—'

অমল আবেগ তরঙ্গিত গলায় বলল, 'আদর আমার চেয়ে বেশি তাকে কেউ করেনি। সে কথা যাক। তাহলে কেস করাই ঠিক, নাকি এ বিয়ে তোমরা মেনে নেবে?'

ইন্দিরা বলল, 'কখনো না।'

মা বললেন, 'মামলা করে যদি তাকে ফেরৎ আনা যায়, তাহলে ফেরৎ নিয়ে আনবি বৈকি।'

বাবা বললেন, 'আজকাল কত এমন হয়। নিয়ে আয় ছাড়িয়ে। আমি আর তোর মা তাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই।'

অমল একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'অত সহজে হবে না বাবা। ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ নয়। দাদা, তোমার কি মত বলো। তুমিই হলে real gaurdian."

আশ্চর্য, অমলও তাঁকে এই মুহূর্তে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। দোষটা যেন তাঁরই।

বিমলেন্দু তিক্তস্বরে বললেন, 'আমার মত কেন ভিন্ন রকম হবে ? আমি love-marriage support করি বলে ? এই প্রেমকেও প্রেম বলিনে, বিয়েকেও বিয়ে বলিনে। তবে মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে না গিয়ে ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে—'

অমল বলল, 'বোঝাবার কিছু নেই দাদা। সে যখন থানার ও. সি'র সামনে আমার চোখে চোখ রেখে বলতে পারল, তার বয়স আঠার পার হয়ে গেছে, আর ওই চোয়াড় গোবিন্দটা তার স্বামী, তখন আর আশা করবার কিছু নেই।'

ইন্দিরা বলল, 'ঠাকুরপো আমাকে নিয়ে চল, দেখি আমার সামনে সে কি করে ও কথা বলে ?'

মা ব্যাকুলভাবে বললেন, 'অমু, আমাকে নিয়ে চল।'

বাবা বললেন, 'চল, আমিও তোদের সঙ্গে যাই। আমি তার হাত ধরে বলব, দিদিমণি, আমরা তোমাকে কেউ কিছু বলব না, তোমার কোন ভয় নাই। লক্ষ্মী সোনা, চল যাই।'

বলতে বলতে চোখের জল ছেড়ে দিলেন বিমলেন্দুর বাবা। হাতখানা এগিয়ে দিলেন সামনের দিকে।

মা দুপা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও-পোড়াছাই, তুমি তাই

বলে আমার হাত ধরতে এসেছ কেন আমার ছেলেদের সামনে? চোখের মাথা খেয়েছ, নাকি ভীমরতি হয়েছে?'

এমন এক দুঃখময় মুহূর্তেও সবাইয়ের মুখে হাসি ফুটল। মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল ইন্দিরা। বিমলেন্দুর মনে পড়ল, মনের গভীর আবেগকে অভিনয়ের ধরণে প্রকাশ করা তাঁর বাবার বহুদিনের অভ্যাস। বিমলেন্দুর এজন্যে মনটা আর্দ্র হয়ে রইল।

কিন্তু অন্য সকলের মত তিনি অমলকে অনুরোধ করলেন না তাঁকে রেসকিউ হোমে নিয়ে যেতে। তিনি জানেন গিয়ে কোন লাভ নেই। সে যদি তার কাকার সামনে ওসব কথা বলতে পেরে থাকে, বাবার সামনেও তা বলতে পারবে।

অমল বলল, 'কাউকে নিয়ে গিয়েই কোন লাভ হবে না। She is so adament. আপাততঃ আইনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।'

বিমলেন্দু বললেন, 'বেশ তাহলে জয়দেবের কাছে যাও, কি তাকে খবর দাও একটা। তার পরামর্শ নেওয়া যাক।'

সে রাত্রে আর হ'ল না, পরদিন ভোরে বিমলেন্দু অমলকে নিয়ে জয়দেবের কাছে এলেন। বিমলেন্দুর মনে আছে, এই বৈঠকখানায় সেদিন মক্কেলদের ভিড় ছিল বলে জয়দেব সেই প্রথম দিন তাঁদের দুই ভাইকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। জয়দেবের স্ত্রী চা আর জলখাবার এনে আপ্যায়ন করবার পর

বিমলেন্দু কিছুই গোপন করেননি। জয়দেবের স্ত্রীর সামনেই দুর্ঘটনার কথাটা খুলে বলেছিলেন। সব শুনে জয়দেবের স্ত্রী সহানুভূতি জানিয়েছিলেন বিমলেন্দুকে, 'যা দিনকাল পড়েছে, আর ছেলেমেয়েগুলি অল্পবয়সে যেভাবে পেকে উঠছে, তাতে কার যে কখন কি বিপদ হবে তা বলা যায় না বিমলেন্দুবাবু। যাক, ওঁর কাছে যখন এসে পড়েছেন ভাবনার কিছু নেই।'

জয়দেবও ভরসা দিয়ে বলেছিল, 'ভাবনার কিছু নেই সত্যি, case খুবই favourable, তাছাড়া তোমাদের বেশি খরচাও হবে না—state versus case, ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি যা কিছু করতে হয় আমি তো আছিই। কথা তো তা নয়, কথা হ'ল কেস তোমরা at-all করবে কিনা!'

অমল অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিল, 'করব না মানে? নাই যদি করব তাহলে আপনার কাছে এলাম কেন জয়দেবদা!'

জয়দেব হেসে বলেছিল, 'এসেছ ভালোই করেছ। ধরো, আসামীর heavy punishment হয়ে গেল, তারপর ওই মেয়ের কি ফের বিয়ে দিতে পারবে?'

অমল জোর দিয়ে বলল, 'অবশ্যই পারব। আপনি কি মনে করেন, ওর নিজের জীবন সম্পর্কে অল্প বয়সের একটা ডিসিসনকে আমরা মেনে নেব? ও আজ নিজে কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু এর জন্যে সারা জীবন ওকে পস্তাতে হবে। আমরা তা কিছুতেই হতে দিতে পারিনে।'

জয়দেব বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তোমার বাবা-মা

বেঁচে আছেন। তাঁদের সংস্কারে বাঁধবে না?'

অমল বলল, 'না। সংস্কারই বলুন আর যাই বলুন, কাজের হাওয়ায় সব বদলায়। তাছাড়া প্রেমই বলুন, সংস্কারই বলুন, আর মায়া-মমতাই বলুন, যার মধ্যে যুক্তি নেই, আমি তাকে প্রশ্রয় দিইনে। এজন্যে কেউ কেউ হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর বলে ভাবে। কিন্তু সংসারে সেই নিষ্ঠুরতার দরকার আছে। শুধু মেয়েলী মমতায় কোন কাজ হয় না।'

জয়দেব আর কিছু বলল না।

তবু মামলা আরম্ভ করবার আগে জয়ন্তীকে আপোষে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা, তার আর একবার চেষ্টা হয়েছিল। অমল আর জয়দেব দুজনে মিলেই সে চেষ্টা করে দেখেছিল। কিন্তু জয়ন্তী কিছুতেই মাথা নোয়ায়নি। কোন স্নেহের অনুরোধ, শাসনের ভয় গ্রাহ্য করেনি সে। তার মুখে একই কথা, 'গোবিন্দকে সে বিয়ে করেছে। সব বুঝে শুনে ভেবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এই কাজ করেছে সে। স্বামীকে জয়ন্তী কিছুতেই ছেড়ে আসবে না।'

অমল দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'আলবৎ ছাড়বে।'

বিমলেন্দুকেও একবার পাঠানো হবে কিনা সে কথা পরিবারের সবাই বিবেচনা করে দেখেছিল। কিন্তু তিনিও যেতে চাননি, ওরাও তেমন আগ্রহ দেখায়নি। ভেবেছে দরকার নেই তাঁকে পাঠিয়ে। বিমলেন্দু নরম প্রকৃতির মানুষ। তিনি কি দেখে গলে যাবেন, কি বলতে কি বলে ফেলবেন তার ঠিক কি?

মামলাটা আগাগোড়া অমল আর জয়দেবই চালিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে দায়রা আদালত পর্যন্ত ওরাই লড়েছে, ওরাই যা করবার করেছে। বড় মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে যেমন বিমলেন্দু প্রত্যক্ষ কোন যোগ রাখেননি, ছোট মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেবার চেষ্টাতেও তিনি তেমনি দূরে সরে রয়েছেন।

মাঝে মাঝে পাড়াপড়শীরা এসে সহানুভূতি জানিয়েছেন, 'বিমলবাবু, কেসের কতদূর হ'ল আপনাদের?'

বিমলেন্দু সবিনয়ে বলেছেন, 'আজ্ঞে, আমি ঠিক জানিনে, যা করবার অমলই করছে।'

ওঁরা হয়তো ভেবেছেন, ব্যাপারটা গোপন করতে চান তিনি। এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা করতে চান না।

তবু কেউ কেউ বলেছেন, 'সত্যি ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে এমন বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেল। বড় লজ্জা আর দুঃখের কথা। তবে আপনার মেয়ের কোন দোষ নেই, একথা দশজনের সামনেও বলতে পারি। কত অল্প বয়স থেকে তো ওকে দেখে আসছি। চমৎকার ফুটফুটে মেয়ে। কি সুন্দর স্বভাব। সেই মেয়ে যে—। ছেলেটাই পাপী মশাই। এমন আরো কত কাণ্ড ঘটিয়েছে কে জানে। এবার আপনি বলি হলেন।'

বিমলেন্দু স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অফিসে সহকর্মীদের মধ্যেও এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কারণ তাঁদের কাছেও ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গোপন

থাকেনি, গোপন রাখেননি বিমলেন্দু। চেপে আর লাভ কি। শশাঙ্কবাবু কাছে এসে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কি বিমলবাবু, কেসটা কি রকম এগোচ্ছে?'

বিমলেন্দু বলেছেন, 'এই ডেট পড়েছে আবার।'

শশাঙ্কবাবু বলেছেন, 'ডেট তো পড়বেই। ক্রিমিন্যাল কেস —ডেটে ডেটে ধূলোপরিমাণ হয়ে যাবে। আপনার এক বছর দেড়বছর দুবছরও লেগে যেতে পারে। কিছুই বলা যায় না। ইংরেজ গেল মশাই, কিন্তু ইংরেজের সেই আঠার মাসে বছরের হিসেবটা গেল না। বিশেষ করে এই আইন আদালতের ব্যাপার। এই গরীব দেশে অত খুঁটিনাটি, অত ফর্মালিটি, আর লোকের অত অর্থদণ্ডের কি দরকার মশাই? সংক্ষেপে সার, সারাংশ নাও। তা তো নয়, যেন অঢেল সময় পড়ে আছে হাতে, অজর অমর আর ধনকুবের হয়ে প্রত্যেকটি মানুষ জন্মেছে। কর্তারা সব ব্যাপারেই বিলম্বিত লয়ের ভক্ত।'

বিমলেন্দু স্মিতমুখে সায় দিয়ে বলেছেন, 'সে কথা ঠিক।'

বিনয়বাবু একদিন চা আর কাটলেট খাওয়ালেন টিফিনের সময়। গরীব মানুষ, বুড়ো হয়েছেন, বাড়িতে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা। টিফিন-ঠিফিন বড় একটা করেন না। খুব হিসেব করে চলেন। এক কাপ চা যদি কেউ খাওয়ায় বর্তে যান। জামা-কাপড় সম্বন্ধেও খুব হিসেবী। ছিঁড়ে গেলেও পাঞ্জাবিটা সহজে ছাড়তে চান না। সেদিন ডোরাকাটা এক নতুন সার্ট গায়ে হাজির। শশাঙ্কবাবু ঠাট্টা করে বললেন, 'কি

ব্যাপার মশাই, হঠাৎ এমন তরুণ যুবক হয়ে গেলেন যে? আপনার জামার বাহার দেখে কলেজের মেয়েরা যে চোখ ফেরাতে পারবে না।'

বিনয়বাবু লজ্জিত হয়ে হেসেছিলেন, 'জামাটা আমার নয় শশাঙ্কবাবু। আমার সেকেণ্ড ছেলের। নিজের জামাটা গিন্নীকে কাচতে দিয়েছিলাম। আছড়ে আছড়ে ছিঁড়ে ফেললে। সেই চোটে দাম্পত্য বন্ধন ছিঁড়ে যায় আর কি! মেজো ছেলে গোপলা এসে ফের গিঁট বেঁধে দিল। বলল, অত চেঁচাচ্ছ কেন, দেখ না, আমার নতুন সার্টটা তোমার গায়ে লাগে কিনা। আমি তো আজ আর কলেজে যাচ্ছিনে। লেগে গেল মশাই, জামাও লাগল জুতোও লাগল। ছেলে বড় হওয়ায় এই এক সুবিধে। এদিক ওদিক না তাকিয়ে ফিট বাবুটি সেজে চলে এলাম।'

শশাঙ্কবাবু মন্তব্য করলেন, 'যযাতির পুনর্যৌবন লাভ আর কি!'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'যা বলেছেন।'

সেই কৃপণ বিনয়বাবু বিমলেন্দুর বিপদের দিনে দুদিন চা খাইয়েছেন। একদিন চা ও টোষ্ট, আর একদিন চা ও কাটলেট। দামটা বিমলেন্দুকে কিছুতেই দিতে দেননি। বলেছেন, 'না মশাই থাক। আপনি আর-একদিন পরে খাওয়াবেন, পরে দেবেন। বেমটকা যে খরচার মধ্যে পড়ে গেছেন আপনি, যে অশান্তির মধ্যে আছেন—'

সেদিন চিংড়ির কাটলেট খেতে খেতে বিনয়বাবু বিমলেন্দুকে

খুব আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনি যেন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এত মুষড়ে পড়েছেন কেন? হয়েছে কি?'

বিমলেন্দু একটু হেসে বলেছেন, 'না না, ভেঙে পড়ব কেন?'

বিনয়বাবু বলেছেন, 'সত্যিই কেন পড়বেন? বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষ আপনি, ভেঙে যাবেন কেন শুনি? লোক অবশ্য কিছুদিন ঠাট্টা-তামসা করবে, সামনে না করুক আড়ালে-আবডালে নিন্দেমন্দ করবে। গ্রাহ্য না করলেই হয়। দুদিন বাদে সবাই ভুলবে, আপনিও ভুলবেন, তারাও ভুলবে। সংসারী মানুষের জীবনে অমন কত ঘটনা ঘটে। কত রটনা রটে। কিছু এসে যায় না মশাই। শেষ পর্যন্ত বুদবুদের মত সবই মিলিয়ে যায়।'

এমনি ছোটখাট সহানুভূতি সমবেদনা তখন অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন বিমলেন্দু। রাশভারি প্রোপাইটার জীবনময় নন্দী তিনি পর্যন্ত নতুন ইয়ার-বুকখানার পাবলিকেশন সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন, 'আপনার ঘটনায় বড় দুঃখিত হয়েছি বিমলবাবু। খরচাপত্র যদি কিছু দরকার হয় নেবেন। আমি একাউন্টটেন্টকে বলে রাখব। অবশ্য কেস তো গভর্ণমেন্ট চালাবে, তবু যদি আপনার কিছু দরকার হয় বলবেন। কোন সংকোচ করবেন না।'

আর একটি ঘটনার কথা মনে আছে বিমলেন্দুর। সেদিন অফিস থেকে ফিরে বাড়ি গিয়ে দেখেন টেবিলের ওপর তাঁর একখানা চিঠি এসে রয়েছে। সাদা বড় খাম। নাম ঠিকানা

টাইপে লেখা। হয়তো কোন বন্ধুবান্ধব, কি কোন তরুণ লেখক লেখা ছাপাবার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছে। অন্যমনস্কের মতই খামের মুখটা খুলে ফেললেন বিমলেন্দু, নীলাভ রঙিন প্যাডের কাগজে মেয়েলী হাতের লেখা একখানা অপ্রত্যাশিত চিঠি। সুমিতা লিখেছে :

'শ্রীচরণেষু,

দাদা, আপনার বিপদের কথা শুনে মর্মাহত হলাম। যদি এসময়ে আমরা আপনার বিন্দুমাত্র কোন কাজে লাগি, কৃতার্থ হ'ব। আপনি আর বউদি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

বিনীতা

সুমিতা

চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করে রাখলেন বিমলেন্দু। যে মেয়ে তাঁর সংসারকে, পরিবারকে সব দিতে পারত, সে এখন সামান্য একটু দাক্ষিণ্য দিতে চায়। যে তাঁর ভাই অমলেন্দুর জীবনকে সাফল্যে সমৃদ্ধিতে ভরে তুলতে পারত, সে অল্প একটু সহায়তার জন্যে উৎসাহী হয়েছে। তবু সেই মুহূর্তে সামান্য একটু সমবেদনার বিন্দুও বড় ভালো লেগেছিল বিমলেন্দুর। তিনি তা মুছে ফেলতে পারেন নি, অগ্রাহ্য করতে পারেননি। অবশ্য সে চিঠির জবাব নিজে আর দেননি তিনি। চিঠি লেখা তাঁর আজকাল কমই আসে। সংক্ষেপে অত ভালো চিঠি লিখতে তিনি কি আর পারবেন ?

ইন্দিরা সেই চিঠি দেখে খুব খুশি হয়েছিল। বলেছিল, 'ওরা সাহায্য করতে পারে বৈকি, খুব পারে, ওর স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট। কেসটা যদি তাঁর ঘরে ট্রান্সফার্ড হয়ে যায়, অন্তত তাঁর বন্ধুবান্ধবের হাতে গিয়ে পড়ে—'

বিমলেন্দু বলেছিলেন, 'ছিঃ, ওসব সুবিধে কেন নিতে যাবে? তোমরা এমনিই জিতবে।'

ইন্দিরা কথাটা ধরে ফেলে বলেছিল, 'তোমরা! মানে এর মধ্যে তুমি নেই?'

বিমলেন্দু বলেছিলেন, 'নেই কে বললে? আমরার মধ্যে কি আমি থাকিনে? আমি না থাকলে কি এ কেস চলতে পারত? সুমিতাকে ভালো করে একটা জবাব দিয়ে দিও। কিন্তু তার কাছে কোন অনুগ্রহ ভিক্ষার দরকার নেই।'

ইন্দিরা বলল, 'দরকার আছে কি না আছে ঠাকুরপো বুঝবে।'

বলে একটু বাদে হেসে ফেলেছিল।

তা ঠিক, অমলেন্দুই সব করছিল। তার অফিস আছে, ক্লাব আছে, সমিতি আছে, বাইরের সভা-শোভাযাত্রা আছে, তা সত্ত্বেও মামলার তদ্বিরের ভার সে নিজের হাতে নিয়েছিল। অবশ্য এ ব্যাপারেও তার দলের ছেলেরা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সবাই তাকে দেবতার মত মান্য করে। অমলেন্দু যখন যাকে যে কাজ বলেছে, সেই তখন সাইকেল নিয়ে কি গাড়ি নিয়ে ছুটেছে। অমলেন্দু অপরাধীর শাস্তি চায় দুই কারণে।

এক হ'ল পারিবারিক কারণ, দুই দলীয় বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যে। নিজের দলের ছেলেদের মধ্যে এধরণের দুর্নীতিকে সে প্রশ্রয় দিতে পারে না। দলে তো শুধু ছেলেরাই নেই, মেয়েরাও আছে। সবাই মিলেমিশে কাজ করে। মেয়েরা চাঁদা তোলে, প্ল্যাকার্ড-ইস্তাহার লেখে, ভোটের সময় ক্যানভাসে বেরোয়, মিটিং করে, বক্তৃতা দেয়, পাড়ার বিভিন্ন পরিবারে গৃহিণীদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে। ছেলেদেরও যে কাজ মেয়েদেরও প্রায় সেই ধরণেরই কাজ। অমলেন্দু গোঁড়া হিন্দু নয়। তার দলের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের বিয়েতেও ঘটকালি করেছে অমলেন্দু। কিন্তু সে সব বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মক্ষম ছেলেমেয়ের পরিণয়। জয়ন্তীর মত এমন বিদঘুটে ব্যাপার নয়। বিমলেন্দু ভাবেন, ওর পক্ষে যুক্তি আছে বৈকি।

জয়ন্তীর এক সার্টিফিকেট স্কুল থেকে পাওয়া গেল—পনের। মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ডে দেখা গেল—ষোল। টালিগঞ্জ তখনো কর্পোরেশনের মধ্যে আসেনি। এই তারতম্যের সুযোগ নিয়ে জয়ন্তী নাকি পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে আরো লম্বা হবার চেষ্টা করে বলেছিল, 'আমার বয়স উনিশ। আমার বাপ-মা আমার বয়স মিথ্যে করে কমিয়ে বলছেন। কমিয়ে বলা ওঁদের অভ্যাস। কুমারী মেয়ের বয়স সবাই কমিয়ে বলে।'

শুনে ইন্দিরা গালে হাত দিয়ে বলেছিল, 'বলে কি, উনিশ! উনিশ তো ওর দিদির বয়সও হয়নি।'

বিমলেন্দুর মা বলেছিলেন, 'বিষ, বিষ, সাক্ষাৎ বিষ। অমন

বিষকে তুমি কি খেয়ে পেটে থুয়েছিলে বউমা ?'

কিন্তু জয়ন্তীর কথাতেই শুধু হবে না। ডাক্তারের সার্টিফিকেট বিমলেন্দুর পক্ষে গেল। পুলিশ আর অমল তৎপর হয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বয়স পরীক্ষা করিয়ে নিল। এক্সরে করাতে হ'ল হাড়ের জয়েণ্টের—আরো কোন্ কোন্ সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। বিশ্রী সব ব্যাপার। যদিও এ পরীক্ষা একেবারে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, তবু circumstantial evidence-এর তা সমর্থন পেল। মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ড ছাড়াও জয়ন্তীর ঠিকুজী বেরোল, মুখে-ভাতের সময় যে পুরোহিত ছিলেন, তিনিও সাক্ষী দিলেন। তিন মাস বাদে ম্যাজিস্ট্রেট সেসনে চালান দিলেন মামলা। গোবিন্দের সেই ড্রাইভার বন্ধুরা উকিলের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সে উকিল কিছুতেই জামিন আদায় করতে পারেনি। এদিক থেকে সুমিতার স্বামী কিছু সাহায্য করেছিলেন কিনা বিমলেন্দু জানেন না। তবে এই উপলক্ষে সুমিতা আর অমলের আরো কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। রেসকিউ হোমেই থাকতে চেয়েছিল জয়ন্তী। কিন্তু বিবেচক ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অভিভাবকদের কাছেই ফেরৎ দিলেন। অবশ্য তার ওপর যাতে উৎপীড়ন অত্যাচার না করা হয় সে নির্দেশও রইল। পুলিশ পাহারায় জয়ন্তী ফিরে এলো বাপের বাড়ীতে। বিমলেন্দু ভাবলেন, ছি ছি ছি, কি লজ্জা, কি লজ্জা। নিজের মেয়েকে নিজে শাসন করতে পারলেন না। তার জন্যে আইন আদালতের সাহায্য নিতে হয়। তাঁর ফের মনে পড়ল সেই

গোয়েন্দা কাহিনীগুলির কথা। সেই কাহিনীর নায়িকা হবার সাধ জয়ন্তীর এমন করেই মিটল। বাপের কাছে এলো আসামীর সাজে। এক আসামী হাজতে, আর এক আসামী বিমলেন্দুর ঘরে। বিমলেন্দু ভাবলেন—এই আর জেল জয়ন্তীর কাছে সমান।

কিন্তু অমলেন্দু ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিল না। লোয়ার কোর্টের এই জয়লাভকে সে রীতিমত সেলিব্রেট করল। একদিন রাত্রে খাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ করল তার কর্মীদলকে,—তারা অনেক খেটেছে, ছুটোছুটি করেছে। সেই সঙ্গে জয়দেব, সুনন্দা, সঞ্জয় আর জ্যোৎস্নাও নিমন্ত্রিত হ'ল। ছেলেদের অনুরোধে দুজনেই গান গাইল—সুনন্দা আর জ্যোৎস্না। কিন্তু ওদের ডাকাডাকি সত্ত্বেও বিমলেন্দু সে আসরে যেতে পারলেন না। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল—এরা কী নির্মম, কী নিষ্ঠুর। অথচ এত দুশ্চিন্তা, এত পরিশ্রমের পর ওরা সবাই একটু আনন্দ-আহ্লাদ করবে বৈকি।

অমলেন্দুর ঘরে না গিয়ে তিনি ছাদে এসে আলিসায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি দিয়ে আসতে আসতে ছোট কোণের ঘরখানা থেকে ছোট মেয়ের কান্না শুনতে পেয়েছিলেন বিমলেন্দু। একবার ভেবেছিলেন, যাবেন ওর কাছে, ওকে সান্ত্বনা দেবেন। কিন্তু যেতে কেমন যেন একটা লজ্জা হ'ল তাঁর। শুধু লজ্জা না, তীব্র ঘৃণা বোধ করলেন। বড় বিশ্রী

আর ভালগার জয়ন্তীর ওই সিঁথির সিঁদুর। যে সিঁদুরকে আচার স্বীকার করেনি, আইন স্বীকার করেনি, তাঁরা স্বীকার করেননি, সেই অবাধ্য একগুঁয়ে সিঁদুরকে সহ্য করা সহজ নয়। কিন্তু এই সিঁদুর ও কিছুতেই কাউকে মুছতে দেবে না। অসাধারণ ওর নির্লজ্জতা, অস্বাভাবিক ওর জেদ। এই জেদকে গুঁড়িয়ে দিতে বিমলেন্দুরও কি মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় না?

বিমলেন্দু তারা-ভরা আকাশের নিচে অনেকক্ষণ ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল কার যেন কান্না শুনতে পাচ্ছেন। অথচ জয়ন্তীর কান্না তো এত ওপরে উঠে আসবার কথা নয়। সে এক অবুঝ বালিকার অস্ফুট কান্না। মানুষের যখন সে কান্না কানে যায়, সে তার নিজের ভিতরের ব্যর্থ পীড়িত বাসনার ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শোনে। এ কান্নার সঙ্গে কি তারও পরিচয় নেই? কার নেই? নেই একথা কে জোর করে বলতে পারে?

কখন যে ইন্দিরা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল, বিমলেন্দু টের পাননি। কাঁধে আলগোছে কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলেন। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন এবার।

ইন্দিরা বলল, 'শোন।'

'কি বলছ?'

'এখানে কী করছ তুমি?'

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।'

'কিন্তু ঠাকুরপো কী ভাবছে বল তো, জয়দেববাবুই বা কী ভাবছেন। ওঘরে তুমি না যাওয়ায় ওঁরা দুঃখ পেয়েছেন, আর

আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমাদের মেয়ের জন্যেই ওঁরা এতটা করেছেন।'

বিমলেন্দু বললেন, 'আমি কি তা অস্বীকার করছি?'

ইন্দিরা বলল, 'কিন্তু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা ভালো। জয়দেববাবু যে অত্যন্ত প্রফেসনাল-ম্যান তা কে না জানে। তা সত্ত্বেও আমাদের কাছ থেকে একটি পয়সাও নিচ্ছেন না। নিজের কাজ ক্ষতি করে তোমার মামলার তদ্বির-তদারক করেছেন। কোথায় সেই পুলিশ কোর্ট আর কোথায় এই আলিপুর। কত হাঙ্গামা পোয়াচ্ছেন। ট্যাক্সি ভাড়াটা পর্যন্ত সব সময় নিচ্ছেন না। আজকালকার কোন বন্ধু এমন করে?'

বিমলেন্দু বললেন, 'সত্যি ইন্দু, ওদের সবাইয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

ইন্দিরা একটু হাসল, 'সে কথা আমার কাছে বলে কী হবে, ওঁদের কাছে গিয়ে বল। জয়দেববাবু বলছিলেন, অমুকের যদি কেস চালাবার ইচ্ছা না থাকে, সে কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলুক, আমরা তার ব্যবস্থা করি।'

বিমলেন্দু বললেন, 'না না না। বল গিয়ে তাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

ইন্দিরা বলল, 'উঁহু, ও কথা বললে ওরা শুনবে কেন? ওদের বলতে হবে, তোমার ইচ্ছা মতই ওরা কাজ করে যাচ্ছে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তাহলে তাই গিয়ে বল। আমার যথাযথ ভাষ্য তুমি ছাড়া আর কে করবে?'

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দিরা। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে গেল। কিন্তু সিঁড়ির কাছ থেকে আবার তার পায়ের শব্দগুলি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। ফের স্ত্রীর স্পর্শ অনুভব করলেন বিমলেন্দু।

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী আবার?'

ইন্দিরা একটু হাসল, 'আর কিছু নয়। দেখ তোমার মনের দুঃখ আমি বুঝি।'

বিমলেন্দু বললেন, 'বোঝ? ভালো কথা।'

ইন্দিরা আস্তে আস্তে বলল, 'বুঝি। এতকাল একসঙ্গে আছি, আমি বুঝবো না তো কে বুঝবে? কিন্তু মেয়েটাকে তো কিছুতেই বোঝানো গেল না। ও কিছুতেই শুনল না আমাদের কথা। জয়দেববাবু বলছিলেন, এমন আজকাল কত কেস হয়। একসঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গীকে আদালতে ফাঁসিয়ে দেয় মেয়ে। দিয়ে বাপ-মার কাছে লক্ষ্মীমেয়ের মত ফিরে আসে। কিন্তু ও যে একেবারে নাছোড়বান্দা।'

বিমলেন্দু হঠাৎ বলে ফেললেন, 'I appreciate it, ও যে সেই হীন কাজ করেনি, আমি তার জন্য ওকে ধন্যবাদ দিই।'

'ওঃ।'

স্থির আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দিরা। সে বিমলেন্দুর দিকে চোখ তুলে তাকাল। আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ফের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল তাঁর। সে দৃষ্টি শুভদৃষ্টি নয়। শুভদৃষ্টি জীবনে একবারের জন্যেই হয়। বাকী সারা জীবন শুভ

আর অশুভের মিশ্রিত দৃষ্টি।

তবু ইন্দিরা সেদিন তাঁকে ওদের কাছে বিট্রে করেনি। কেস চালাবার দিকেই যে তাঁর মত একথা স্পষ্ট করেই বলেছে। অমল পরদিন দাদার কাছে তা verify করে নিয়েছিল।

এরপর অবশ্য সামলে নিয়েছিল বিমলেন্দু। নিজের মনটা যখন তাঁর কাছে হাতের আমলকিটির মত নয় হাতের রেখাগুলির মতই অস্পষ্ট আর জটিল, তখন সেই মন নিয়ে নিজের মনে পড়ে থাকাই ভালো। ওরা যা করছে করুক। একরোখা না হলে কাজ করা যায় না। ওদের কাজের পিছনে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। সেই যুক্তিকে অস্বীকার করার মত মনের জোর কোথায় বিমলেন্দুর।

তাছাড়া যত দিন যেতে লাগল, মামলার কিনারা হতে যত দেরি হতে লাগল, ততই বিয়নবাবুর কথাগুলি মনের মধ্যে বসে গেল বিমলেন্দুর। সত্যি ঘটনাটা এমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যা নিয়ে সারাজীবন তো দূরের কথা, পুরো একটা বছরও বসে বসে ভাবতে পারেন। জয়ন্তী তাঁর মেয়ে। এ ঘটনা জয়ন্তী ঘটিয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে তারই সারা জীবনের সম্পর্ক, বিমলেন্দুর নয়। এতে তাঁর সামান্যই এসে যায়, তাঁর ভাবজীবন, তাঁর কাজকর্ম, তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা আর আনন্দের সঙ্গে এ ঘটনার কী সম্পর্ক? প্রায় কিছুই নয়। সংসারে তিনি আগেও যেমন নির্লিপ্ত ছিলেন, এখনই বা থাকতে পারবেন না বা থাকবেন না

কেন? বিমলেন্দু ভেবে দেখলেন, এর আগে সংসারের কোন ব্যাপার নিয়েই তিনি এত বেশি ভাবেননি। এই সামান্য একটা হাস্যকর দুর্ঘটনা তাঁর মনকে কোন অধিকারে এতখানি অধিকার করে রাখতে চায়? তিনি তা রাখতে দেবেন কেন?

বিমলেন্দু শঙ্কু-রঙ্কুকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তাদের পড়াশুনোর খোঁজখবর নিতে লাগলেন। বাপের এই আকস্মিক মনোযোগ আর অত্যধিক বাৎসল্যে তারা একটু বিরক্ত হ'ল, একথাও অবশ্য বুঝতে পারলেন তিনি। দায়রা আদালতে কেস চলতে লাগল। অনেক দিন পরে পরে এক একটা তারিখ পড়ে। পুলিশ দু-তিনজন করে সাক্ষী হাজির করে, তারপর শুনানী মুলতুবী থাকে।

জয়ন্তীকে বিমলেন্দুর বাবা-মা বোঝান, তাঁর স্ত্রী বোঝান, অনুরোধ উপরোধ করেন। জয়ন্তী ইচ্ছা করলেই কেসটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাড়াতাড়ি একটা মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু জয়ন্তী অনড় অটল। সে যে স্টেট্‌মেণ্ট থানায় দিয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দিয়েছে, দায়রা আদালতেও তার নড়চড় করল না।

বিমলেন্দুর বাবা তেড়ে গিয়ে জয়ন্তীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের কথা যদি না শুনিস কেটে কুচি কুচি করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব। এক ফোঁটা মেয়ে তার এত বড় স্পর্ধা? ঠিক বলছি আমি কুচি কুচি করে কাটব।'

জয়ন্তী হেসে বলল, 'কাটো না দাদু, তাহলে তো একেবারে—'

বিমলেন্দুর মা বললেন, 'হ্যাঁ রে জয়ন্তী, তুই কি পাষাণে গড়া ?'

জয়ন্তী জবাব দিল, 'ঠাকুমা, আমরা সবাই পাষাণে গড়া।'

ইন্দিরা বলল, 'তুই কি আমাদের কারোর কথাই শুনবিনে ?'

জয়ন্তী বলল, 'আমার কথা যদি শোন, তাহলে শুনব।'

এরপর আর কথা চলে না। তাই কেস চলতে লাগল। জয়ন্তী দিনের বেলায় ওপরের কোণের ঘরটায় থাকে। কিন্তু রাত্রে ইন্দিরা তাকে নিয়ে শোয়।

একা থাকতে দেয় না, পাছে আবার পালায়।

বিমলেন্দু একা থাকেন খাটের ওপর। শঙ্কু-রঙ্কু থাকে ঠাকুরদা ঠাকুমার ঘরে।

বিমলেন্দু লক্ষ্য করেন, জয়ন্তী মার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে। একটি বারের জন্যেও পাশ ফেরে না। কারো সঙ্গে কথা বলে না। সত্যি কী কঠিন ধাতুতেই না গড়া ওর শরীর। বাপ-মার ওপর কত ঘৃণা, বিদ্বেষ আর আক্রোশ নিয়েই না ও তাঁদের সঙ্গে বাস করছে। বিমলেন্দুর একেক সময় মনে হয়, কোন সম্বন্ধ নেই ওর সঙ্গে, রক্তের সম্বন্ধ পর্যন্তও ধুয়ে মুছে ফেলেছে। ও একেবারে পর, সত্যিকারের শত্রু।

শত অনুরোধ উপরোধেও ও সিঁথির সিঁদুর মুছতে রাজী

হয় না। পাড়াপড়শীর মেয়েরা দেখে হাসে। বিমলেন্দু লজ্জা পান। কিন্তু ওর কোন লজ্জা নেই।

পরিবারের সবাইকে যাতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয় অমলেন্দু তার ব্যবস্থা করেছে। মামলার বিবরণ যাতে কোন কাগজে ছাপা না হয় অমলেন্দু চেষ্টা-চরিত্র করে সে ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

তবু বিমলেন্দু আর তাঁর স্ত্রীকে একদিন সাক্ষ্য দিতে যেতে হ'ল। মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে অবশ্য রেহাই পাওয়া যেত, কিন্তু বিমলেন্দু তা চাইলেন না।

তাছাড়া পুলিশ বলল, 'কেস জোরালো করার জন্যে জয়ন্তীর বাবা-মার সাক্ষী অবশ্যই দরকার।'

বিমলেন্দুর বাবা বললেন, 'খোকা এসব ব্যাপারে ছেলে মানুষ, ওর বদলে আমি গেলে যদি হয়—'

অমল বলল, 'না তা হয় না। দাদাকেই যেতে হবে।'

বিমলেন্দু এবার গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, 'তোর জন্যে শেষ পর্যন্ত এত করতে হ'ল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল আমাকে।'

অমল রূঢ়ভাবে জবাব দিল, 'আমার জন্যে নয় দাদা, তোমার মেয়ের জন্যে। মেয়েকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তোমাকে যেতে হবে বৈকি। গুণ্ডার হাত থেকে নিজের মেয়েকে রক্ষা করবার জন্যে লোকে প্রাণ পর্যন্ত দেয়, আর তুমি এইটুকু করতে পারবে না? তাছাড়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছ—তাও অপর

কারোর জন্যে না, নিজের মেয়ের জন্যে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তবু তো একটা কেলেঙ্কারি—'

অমল উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কেলেঙ্কারি মানে? কেলেঙ্কারি যা হবার আগেই হয়েছে, এখন তা মুছে ফেলবার, rectify করবার চেষ্টা চলছে। তুমি নিজে অন্যায় করনি? তুমি দেশের আদালতে, দেশের কাছে অন্যায়ের প্রতিকার চাইবে, তাতেও তোমার লজ্জা? তুমি বাবার অনেক কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করো, কিন্তু তুমি নিজে যে অসংখ্য প্রেজুডিসে ভরা তার কি হবে? তোমাদের এই সূক্ষ্ম সম্মানবোধের জন্যে—আমি বলি ভুয়ো সম্মানবোধের জন্য, অনেক অপরাধীর শাস্তি হয় না, দোষী নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। সমাজের সর্বস্তরে এই ব্যাপার দেখি। আমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি-গলদের প্রতিকার করিনে, প্রতিবাদ করিনে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত হলে কম্বল চাপা দিয়ে ঢাকি, কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকি, উচ্চ মধ্যবিত্ত হলে একটু হেসে কার্পেট বিছিয়ে দিই। আর সেই কম্বল আর কার্পেটের তলায় স্তরে স্তরে ধুলো ময়লা জমে আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়।'

বিমলেন্দু চমকে উঠলেন। এসব কথা তো অমলের একার না, এসব কথা তো তারও।

অমল শেষে বলল, 'তুমি যদি নিজে না যাও, আমি তোমাকে হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব, আমি সহজে ছাড়ব না।'

ওর শেষ কথাগুলোর মধ্যে একটু আব্দারের সুর ছিল।

বিমলেন্দু তা শুনে হেসে বললেন, 'টেনে নিতে হবে না। আমি নিজেই যাব।'

গিয়ে অবশ্য খুব স্বস্তিবোধ করেননি বিমলেন্দু। স্বস্তির জায়গা তো নয়। আদালত এক আলাদা জগৎ। বিমলেন্দুর পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশ। এখানে সমাজের আলাদা চেহারা। ব্যস্ত-ত্রস্ত কতকগুলি মানুষের মুখ। পুলিশ, উকিল, আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী, রক্ষী কাউকেই সুন্দর বলে মনে হয় না বিমলেন্দুর। সবাই যেন সূক্ষ্ম রুচি শিল্প সাহিত্য ইতিহাস দর্শন সভ্যতার যা সব চেয়ে গর্ব সব ভুলে গিয়ে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। এখানে কারো সে সব কথা ভাববার অবসর নেই। এখানকার জীবন crude, স্থূল, রূপহীন। দুজন আসামীকে বিমলেন্দুর সম্মুখ দিয়ে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি শুনলেন ওরা ডাকাতি মামলার আসামী। ওদের বিরুদ্ধে মার্ডারের চার্জও আছে। জালিয়াতির দায়ে ধরা পড়েছেন আর একজন ভদ্রলোক। অন্তত বেশটা ভদ্র। আর একটি মেয়েকে ওরা তাঁর সামনে দিয়ে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেল। প্রায়ই তাঁর জয়ন্তীর বয়সী। জয়দেব বলল, 'মেয়েটা নাকি হাসপাতালে ওর তিনদিনের বাচ্চা ছেলেকে পিঠের তলায় ফেলে পিষে মেরে ফেলেছে। নিজেও জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ধরা পড়ে গেছে।'

বিমলেন্দু সেকথা শুনে কানে আঙুল দিলেন, 'ছি ছি ছি।'

জয়দেব তার পাশের চেয়ারেই বসেছিল, হেসে বললে, 'কানেই আঙুল দাও আর চোখই ঢেকে রাখ, এই হ'ল তোমাদের সমাজের রূপ, একমাত্র রূপ একথা বলি না, কিন্তু এ চেহারাটাও আছে। তবু ক্রিমিনালদের কত পার্সেন্টই বা ধরা পড়ে, তাদের কজনকেই বা পুলিশ কোর্ট পর্যন্ত টেনে আনতে পারে তার আগে অনেকেই ফসকে যায়।'

বিমলেন্দু বলেছিলেন, 'যারা পুলিশের হাত থেকে ফসকাতে পারে না, তোমরা তাদের সহায় হও। তোমরা মোটা টাকা নিয়ে নিজের হাতে তাদের হাতকড়ি খুলে দাও জয়দেব। যে উকিল চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাসকে যত বেশি সাধু প্রমাণ করতে পারে, তার তত বড় বেশি পসার।'

জয়দেব হেসে বলেছিল, 'আইন-আদালতের আর কিছু না জানলেও এ খবরটুকু দেখি রাখ। হ্যাঁ কোন কোন সময় আমাদের তা করতে হয়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে আমাদেরও তো বেঁচে থাকা চাই।'

বিমলেন্দু বলেছিলেন, 'তাহলেই দেখ, তোমরা আইন পড় বে-আইনী কাজ করবার জন্যে, তোমরা আইন মানো, কিন্তু নীতি মানো না। তোমরা সমাজকে মেরে মক্কেলকে বাঁচাও।'

জয়দেব একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'সব সময়ই অবশ্য তা করিনে। কোন কোন সময় তা করতে হয় বৈকি। তবে তখনো indirectly আমরা সমাজের উপকারই করি। অনেক সময়ে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হবার ভয় থাকে, আমরা সেই ভয়

থেকে মক্কেলকে রক্ষা করি। অনেক সময় তাকে আমরা জেলের হাত থেকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে নিজের হাতে ছেড়ে দিই। সে তখন নিজেকে নিজে শোধরায়।

হঠাৎ বিমলেন্দুর মনে হ'ল, একথা তো গোবিন্দের পক্ষের উকিলও বলতে পারে।

কিন্তু মনের কথাটা তিনি সেই মুহূর্তে বন্ধুকে বললেন না। বলবার সাহস পেলেন না।

জয়দেব বলতে লাগল, 'যাই বল, আমাদের প্রফেশন অনেক কারণে নোবল প্রফেশন। আমরা ব্ল্যাকমার্কেটিং করিনে, কলকারখানার মালিকের মত নানা ফিকিরে গরীবের। রক্ত চুষে খাইনে। অনেকের তুলনায় আমরা ভদ্র, সৎ, আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ একেবারে যে নির্মল তা বলিনে, কিন্তু অনেকের চেয়েই পরিষ্কার। ধরো এই যে স্বাধীনতা এলো, এতে কোন প্রফেশনের লোকের দান সব চেয়ে বেশি বল তো? হিসেব করলে দেখা যাবে সংখ্যায় আর গুরুত্বে আমরাই বেশি। সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে মধ্যবিত্ত সমাজ। আর সেই সমাজের একটা বড় অংশ আইন আদালতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তুমি জেনেশুনে শুধু দোষারোপ করলে তো হবে না।'

বিমলেন্দু বললেন, 'স্বাধীনতার আগের অবস্থা তো শুনলাম, কিন্তু পরের অবস্থা?'

জয়দেব বলল, 'পরের অবস্থা? দেখ, সব অবস্থাই একই

ব্যবস্থাসূত্রে জড়িত। সেই ব্যবস্থা যতদিন না পাল্টায়, আমরা মুখে যতই আইন নীতি ধর্ম দেশ আর সমাজের বুলি আওড়াই না কেন, পেটের জন্য আমরাও চোর ডাকাতের হয়ে লড়ব, তাদের থলিদারের কাছে হাত কচলাবো। কারণ আমরাও তো ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে পরে থাকতে চাই, শুধু খেয়ে পরেই সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে থাকতে চাই। কিন্তু টাকা ছাড়া দুনিয়ায় কোন সাধই মেটে না।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তবু তোমাদের প্রফেশনটা মোটামুটি ভালো। তোমরা খেয়ে পরে একরকম আছ।'

জয়দেব বললে, 'তুমি ভিতরের খবর কিছু জানো না। আমাদের মধ্যে অনেকেই খুব কষ্টে আছে। যদিও দেশে চুরি ডাকাতির অভাব নেই, বাড়ি ঘর সম্পত্তি বিবাদ বিসংবাদ আছে। সেলট্যাক্স, ইনকামট্যাক্স, রেণ্ট-কণ্ট্রোলের কৃপায় ওদিককার উকিলেরাও কিছু কিছু পাচ্ছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা আর কত? অনেকেই পাচ্ছে না। আমাদের বার-লাইব্রেরীতে এসে একবার দেখ, কত অর্ধভুক্ত উকিল চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে, কি ঘুমের ভান করছেন, দেখতে পাবে। কত জনে দিনের পর দিন বসে বসে দাবাই খেলছেন। হাতী ঘোড়ার চালে মত্ত থেকে যদি হাঁড়ির চালের চিন্তাটা দু'দণ্ড ভুলে থাকা যায়। আমাদের মধ্যে এখনও বটতলায় ভ্রাম্যমানদের সংখ্যাই বেশি। আরো কত কেলেঙ্কারি হয়। এখনও আমরা মক্কেলের পাঞ্জাবির আস্তিন ধরে টানি, কাছা ধরে টানাটানি করি।

নিজেদের মধ্যে রেষারেষি হানাহানি চলে প্রায়ই—সোনাগাছি, রূপাগাছির অবস্থা। চল এবার, আমাদের কেসটা উঠেছে।'

দশটায় এসে বসেছিলেন বিমলেন্দু। কেস উঠল আড়াইটায়। পুরনো বন্ধু জয়দেবের সঙ্গে তর্কবিতর্কে আলাপ আলোচনায় সময়টা মন্দ কাটেনি। নিজের দুঃখ দুর্বিপাকের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের দুঃখ ভোলার কি এই একমাত্র পথ—পরের দুঃখের কথা মন দিয়ে শোনা, চোখ দিয়ে দেখা? নিজের দুঃখ মোচনের এই কি একমাত্র পথ—পরের দুঃখ ঘুচানোর চেষ্টা করা?

সেদিন দুজনের সাক্ষ্য ছিল। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর। ইন্দিরাকে নিয়ে মাঝে মাঝে এর আগে কয়েক জায়গায় ঘুরেছেন। বেশি দূরে না, কাছাকাছিই গেছেন দু'একবার হাওয়া বদলাতে—পুরী, ঘাটশীলা, মধুপুর। কিন্তু এমন জায়গায় যে আসতে হবে তা কি কোনদিন ভেবেছিলেন? কিন্তু এও তো এক মন্দির, বিচারালয়। এখানে ন্যায়ের হয়ে, নীতির হয়ে মানুষ লড়বে, তাই তো ধর্মাধিকরণ। তবু সংস্কোচ, কুণ্ঠায়, লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন বিমলেন্দু। কিছুতেই মনের সেই প্রসারতাকে খুঁজে পেলেন না। জজের ডান দিকে জুরীরা, পাবলিক প্রসিকিউটার, বাঁ দিকে সেই দৈত্যাকার আসামী। চিড়িয়াখানার জন্তুকে এবার সত্যিই যেন খাঁচায় পোরা হয়েছে। একবছর হাজতে থেকে তার চুল দাড়ি বেশ বড় বড় হয়েছে। বিশ্রী আর বিকট হয়েছে চেহারা। তার দিকে চেয়ে বিমলেন্দুর

মনে পড়ল সেই প্রথম পরিচয়ের কথা। সিঁড়ির উপর সেই সংঘাত। তারপর লজ্জিত হয়ে জিভ কেটে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল গোবিন্দ। এখন আর ওর মুখে সেই অপ্রতিভের হাসি নেই, ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি নেই। এখন সংঘর্ষ মানে চিরজীবনের সংঘর্ষ, জীবন মরণের সংগ্রাম। এখন গোবিন্দের চোখে ক্রূর, হিংস্র ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি। কিন্তু বিমলেন্দু ভাবলেন, তার এই ক্রোধের কোন মানে হয় না। ও যদি শিক্ষিত হ'ত, সভ্য হত, এই দণ্ড ও হাসিমুখে মাথা পেতে নিত। কী করে ও আশা করতে পারে, ওর মত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, কুলশীল-হীন, শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন শরীর-সর্বস্ব এক বর্বরের হাতে নিজের মেয়েকে সঁপে দেবেন বিমলেন্দু? ভিন্ন জাত, ভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়ের হলেও যদি অন্য গুণ আর মানসিক সম্পদ থাকত, ওর কথাটা বিবেচনা করে দেখতেন বিমলেন্দু। মনের সেই ঔদার্য তাঁর ছিল। তিনি তখন শক্ত ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে পরিবারের আর সবাইয়ের সঙ্গে যুঝতে পারতেন। কিন্তু এই অর্ধ-মানব অর্ধ-বর্বরের পক্ষে বলবার মত একটি কথাও যে তাঁর নেই। নিজের মেয়ের ভবিষ্যতের কথা তো তাঁকে ভাবতেই হবে। বিমলেন্দুর মা বলেন, ও এক যাদুকর, মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে দুধের মেয়েটাকে বশ করেছে। বিমলেন্দু সে কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁর মা বলেন, তুই ঠিক জানবি, খাবারের সঙ্গে বিষের মত কিছু মিশিয়ে ওই দৈত্যটা ওকে বাধ্য করে রেখেছে। কোন কোন বিষ খেলে মানুষ মরে, কোন কোন বিষে আধমরা হয়ে

থাকে। ওই বুনো মানুষটা সেই ধরণের বিষ দিয়েছে ওকে। বিমলেন্দু ওসব বিশ্বাস করেন না। তিনি জানেন, কিসে কি হয়েছে। ওর দেহের মধ্যে না হোক, দৈহিক শক্তির মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব রূপ খুঁজে পেয়েছে জয়ন্তী। পর্বতের মত বিশাল বপুকে নিজের আয়ত্বে রাখার আনন্দে ও আর সব-কথা ভুলেছে। এই মেয়েই হয়তো আরো বয়স হলে কোন intellectual giant-এর প্রেমে পড়তে পারত। তখনো আর কোন দিকে তাকাত না, কোন কথা ভাবত না। এমন যে হয় তা তিনি দেখেছেন। সেই দুর্ঘটনাকে বিমলেন্দু হয়তো সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু শুধু এক শরীরী দৈত্যকে কি করে সহ্য করবেন? বিমলেন্দু জানেন, জয়ন্তীর এই আসক্তির মূলে শুধু সাময়িক মোহ। তবু সেই ক্ষণিকতার কি দুর্বার শক্তি।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল বিমলেন্দুকে। জয়দেব হেসে বলল, 'তুমি অত কাঁপছ কেন? কোন ভয় নেই তোমার।'

অমল পার্শ্বচর হিসেবে কাছেই আছে। সেও অভয় দিয়ে বলল, 'বেশি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে না।'

পাবলিক প্রসিকিউটার সবিনয়ে বললে, 'আপনাকে এত কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ওপক্ষের উকিলটি নাছোড়-বান্দা। যাক এতে আমাদেরই সুবিধে হবে। আমরা culprit-এর heavy punishment চাই। আপনার মেয়েকে আপনি তাড়াতাড়ি রাহুমুক্ত করুন, সেইটাই আমাদের ইচ্ছা।'

বিমলেন্দুর সাক্ষ্যে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। তাঁর স্ত্রীও অল্পেই ছাড়া পেয়েছিলেন। পুলিশ পক্ষের উকিল একটি তথ্যই শুধু তাঁদের মুখ থেকে জেনে জজ আর জুরীদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা প্রকৃতই জয়ন্তীর মা-বাপ। তাঁদের মেয়েও নাবালিকা। দুর্বৃত্ত আসামী সেই মেয়েকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে বের করে নিয়ে গেছে। তাঁরা মেয়েকে ফেরৎ চান, কিছুতেই আসামীর হাতে সঁপে দিতে চান না। কিন্তু বিপক্ষের উকিল অত সহজে ছেড়ে দিলেন না। শ্লেষ ব্যঙ্গ পরিহাসে তাঁর জেরা যুক্তির দিক থেকে জোরাল না হোক, সরস হয়ে উঠল, বিমলেন্দু আর তাঁর স্ত্রীর অতই যদি সাধু উদ্দেশ্য ছিল কেন অমন বাড়ন্ত গড়নের মেয়েকে অমন বলবান পুরুষের সঙ্গে মিশতে দিয়েছিলেন? আগুনে ঘি পড়লে কি হয় তা কি তাঁরা জানতেন না? কোন বিশ্বাসে কোন ভরসায় ওই রকম এক অনাত্মীয় আধাশিক্ষিত লোককে তাঁরা বাড়ির সব জায়গায়—খাবার ঘরে, শোবার ঘরে, বারান্দার কোণে, কানাচে, সিঁড়িতে, ছাদে সব জায়গায় চরে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছিলেন? কোন বিপদ ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা কেন তাঁদের তখন মনে জাগেনি? তাছাড়া যতবারই বাড়ির লাইট ফ্যান রেডিও নিয়ে গোলমাল হয়েছে, বেছে বেছে ওই একটি লোককেই তারা ডেকে পাঠিয়েছেন, কত সময় অন্ধকার ঘরে ওরা একা কাছাকাছিও রয়েছে, সে সব কারো চোখে পড়েনি। তাছাড়া এ তো একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়। দেড় বছর দুবছর ধরে

সমানে এই লুকোচুরি খেলা চলেছে, তখন তাঁরা কেন তা ধরতে পারেননি বা বাধা দেননি? ওই বিরাটকায় আধাশিক্ষিত মানুষের কামনা-বাসনাও যে বিপুল হতে পারে, তা কি তাঁরা ভেবে দেখেননি? তারপর ও-পক্ষের exhibitগুলিও বার করলেন। ওদের মধ্যে গোপনে চিঠিপত্র চলত তা জয়ন্তীর মা জানতেন না বলে একেবারে অস্বীকার করেছেন। অতবড় মেয়ের মা হয়ে জানা উচিত ছিল, খোঁজ রাখা উচিত ছিল। জয়ন্তী নিজেও বলেছে, তাছাড়া তার চিঠিপত্রেও প্রমাণ, সেই আগে মুগ্ধ হয়েছে, সেই ওকে আগে প্ররোচিত করেছে। জয়ন্তীর কোন কোন চিঠির কিছু কিছু অংশ একঘর-ভরা লোকের মধ্যে আসামী পক্ষের উকিল তাঁর সেই হেঁড়ে গলায় পড়ে শোনাতে লাগলেন।

'আমার দিদি বুঝি কাল তোমাকে পশু বলে গাল দিয়েছিল, আর তুমি তাতে রাগ করেছিলে। ও তো পশু বলবেই। ওর বর যে একটা মর্কট। তোমার কাছে কীটের মত, পোকা-মাকড়ের মত। আমি তোমাকে বলি পশুপতি। পশুপতি মানে কি জানো? সিংহ। কিন্তু হাতী-সিংহ বলতেও আমার তত ভালো লাগে না। ওগুলো বড় পুরনো, বড্ড চেনাচেনা। সেদিন চিড়িয়াখানায় সবাই মিলে বেড়াতে গিয়ে আমরা যে পাইথন দেখে এসেছিলাম, আমার তোমাকে সেই পাইথন বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। তাই বলে ডাকব, কেমন? তুমি যখন হেঁটে যাও, আমি দেখি একটি পাইথন হেঁটে যাচ্ছে। কী মজা

লাগে। আমাদের যখন বিয়ে হবে, আমি কিন্তু দিদির মত তোমাকে লক্ষ্মী সোনা বলে আদর করব না, ওকথা তুমি বলো। আমি বলব, আমার পাইথন, আমার পাহাড়, আমার মন্দার-পর্বত।'

আসামী পক্ষের উকিল বললে, 'আর একখানা চিঠির খানিকটা শুনুন—সেদিন রাত্রে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম জানো? আমরা যেন অনেক দূরে একটা অচেনা জায়গায় বেড়াতে গেছি। কি সুন্দর জায়গা! তেমন জায়গা আমাদের কলকাতায় নেই, ঘাটশীলা মধুপুরে নেই। কাশ্মীর আর সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে বোধ হয় খানিকটা মিল আছে। সেদিন আমাদের ভূগোলের দিদিমণি বলছিলেন, সুইজারল্যাণ্ড পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ। তবে কাশ্মীরও খুব ভালো—নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন। নিজের দেশের কাছে কি কিছু লাগে? দিদিমণি বলছিলেন, স্বপ্নের দেশ বুঝি সবচেয়ে সুন্দর। নিজের দেশের সঙ্গে বিদেশের মিশেল আছে তার মধ্যে। সেই দেশে আমরা দুজনে গেছি। আর আমাদের পিছনে পিছনে পা টিপে টিপে গোয়েন্দা হাঁটছে। তুমি যেন একটা সাংঘাতিক ডাকাতি করে এসেছ। আর পুলিশ তা টের পেয়ে তোমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু নিলে হবে কি? তোমাকে কিছুতেই কেউ ধরতে পারছে না। হঠাৎ দেখি কি, গোটাকয়েক লালপাগড়ি খুব জোরে দৌড়চ্ছে। আসলে কিন্তু গোয়েন্দাদের লালপাগড়ি থাকে না। কিন্তু স্বপ্নে তো কত অদ্ভুত কাণ্ডই হয়। আমার বুক

টিপ টিপ, টিপ টিপ। এই বুঝি তোমাকে ওরা ধরে ফেলল। কিন্তু যেমন ওরা তোমার কাছে গেছে, অমনি তুমি একটা পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়ালে। আর পুলিশ ভাবল, ভূমিকম্পে একটা নতুন পাহাড় হঠাৎ গজিয়ে গেছে। ওরা তোমাকে কেউ দেখতে পেল না। পুলিশের মাথায় শুধু লালপাগড়ি—ওদের মাথায় কি আর বুদ্ধি আছে? আমি কিন্তু সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আমি সবাইকে দেখছি, আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তোমার বগলে একটা কাশ্মীরী কাঠের বাক্স। কি সুন্দর তার কারুকাজ। তার মধ্যে দামী দামী সব মণিমুক্তা আর রত্ন। তুমি আমার কাছে সেই বাক্সটা রাখতে দিলে। তারপরে কি হল আর মনে নেই, ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতে দেখি কি, আমার বুড়ী ঠাকুমা আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। কোথায় আলেকজাণ্ডার, নাদির শা, তৈমুর লঙ, আর কোথায় শাঁকচুন্নী।'

চিঠির শেষটা শুনে জুরীদের কেউ কেউ হেসে উঠলেন। বিমলেন্দুর মনে হল গুরুগম্ভীর জজ সাহেবও মুখ টিপে হাসলেন। তারপর বললেন, থাক থাক, ওসব চিঠি আপনাকে পড়তে হবে না। ওগুলি তো রয়েইছে। ওগুলি আমরা সবাই দেখে নিতে পারব।

জুরীরা সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানা চিঠি দেখতে চাইলেন। জয়ন্তী কাছেই একটা চেয়ারে বসেছিল। সে লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল।

ওর পক্ষের উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি জানতে চাই, মোটা মোটা খামে এই সব লম্বা লম্বা চিঠি যখন যেতো, মিসেস সোম কি তার কিছুই টের পেতেন না? কিছুই দেখতেন না?,

কিন্তু আসামীপক্ষের উকিলের ধমকের বহরে কিংবা সওয়ালের দৈর্ঘে জুরীদের মন নরম হয়নি। হয়েছিল জয়ন্তী আর গেবিন্দের শেষদিনের জবানবন্দীতে। সেই শুনানীর দিনেও বিমলেন্দু উপস্থিত ছিলেন।

জয়ন্তী যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল, তার ভঙ্গি দেখে বিমলেন্দুর মনে হয়েছিল সে যেন এক পূর্ণযৌবনা নারী। সে যেন এই এক বছরের মধ্যেই স্কুলের মেয়ের রোমান্টিক চিঠি লেখার বয়েস ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে। নিঃসঙ্গ একক যুদ্ধে কঠিন হয়েছে তার দেহভঙ্গি, মুখের ভাব। সে যেন সত্যিই এক মঞ্জুরীহীন মরুভূমির লতা।

জয়ন্তী বলেছিল, 'আমি আপনাদের অনেকবার বলেছি, ওর কোন দোষ নেই; আমি নিজে ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে চলে এসেছি, কালীঘাটে পুরুতের সামনে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছি। তবু কেন আপনারা তা বিশ্বাস করছেন না, মেনে নিচ্ছেন না? আমরা যদি মানি, আপনারা মানবেন না কেন? আপনারা বলেছেন, আমার বয়েস কম। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেছেন, আমার বয়স কম। আমি বলছি, বেশি, অনেক বেশি। পাবলিক প্রসিকিউটার আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বয়স বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু আপনারা কেবল আমার মুখের দিকেই তাকাচ্ছেন, আমার

বুকের মধ্যে কিভাবে ভেঙেচুরে যাচ্ছে, তা তো কই আপনারা কেউ দেখতে পাচ্ছেন না? আমার কাকা নাকি আমাকে খুব ভালোবাসেন। আগে বাসতেন—এখন আর বাসেন না। তা যদি বাসতেন, আমি যাকে ভালোবেসেছি, তাকে অমন করে মারতে পারতেন না। সেই মারের দাগ এখনও ওর পিঠে লেগে রয়েছে। একটা চোখ তো প্রায় যেতে বসেছিল। আমার বুঝি এতে দুঃখ হয় না? সেই চোখ বুঝি আমার চোখ নয়? দোহাই আপনাদের, ওকে আপনারা ছেড়ে দিন, ওর কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। আপনারা ওকে ছেড়ে দিন। আমরা ভালভাবে থাকব। চিঠিতে যা লিখেছি, তা হবো না, ডাকাত হবো না, চোর হবো না। আমার অনেক বুদ্ধি বেড়েছে। ওসব বইয়ের গল্প বইতেই সাজে, সত্যিকারের মানুষকে ভালোমানুষ হতে হয়। ওর অনেক গুণ আছে, আপনারা জানেন না, আমি জানি। আমরা না খেয়ে মরব না। ও যদি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হয় আমি তার স্ত্রী হবো, ও যদি ড্রাইভার হয় আমি তার বউ হবো। মহাভারতের সুভদ্রার মত আমিও গাড়ি চালাতে শিখব। ওকে আপনারা ছেড়ে দিন। আমাদের ভালো হবার সুযোগ দিন।'

বিমলেন্দুর চোখে পড়েছিল, জুরীদের মধ্যে এক বুড়ো ভদ্রলোক রুমাল থাকতেও কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছেছিলেন।

আসামীর আবেদন অবশ্য অত appealing হয়নি। সে বলেছিল, জয়ন্তীর কোন দোষ নেই, সব দোষ তার। কারণ সে

এক নাবালিকাকে নিয়ে এসেছে। তার জন্যে সে সকলের কাছে মাপ চাইছে। কিন্তু সে যদি ছাড়া পায়, সে সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্তীকে নিতে চাইবে না। অন্য জায়গায় থেকে নিজের কাজকর্ম করবে। তারপর জয়ন্তী যখন সত্যিই সাবালিকা হবে, ওর বয়স আর বুদ্ধি বাড়বে, তখন যদি সে গোবিন্দের সঙ্গে চলে আসতে চায়, তখন ওকে রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করবে। তার আগে বিয়ের নাম মুখেও আনবে না। জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলতে কি, দেখা করতেও চাইবে না।

দুদিন বাদে দায়রা জজ রায় দিয়েছিলেন। জুরীরা এক মত হয়ে আসামীকে নির্দোষ বলেননি, তবে লঘুদণ্ড দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। জজেরও তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। ইতিমধ্যে আসামীর একবছর তো হাজতবাস হয়েই গেছে, প্রায়শ্চিত্ত তাতে কম হয়নি। আরো দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ডই ওর পক্ষে যথেষ্ট হবে। অর্থদণ্ড করে লাভ নেই কারণ ও তা দিতে পারবে না। আর জয়ন্তীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার বাবা-মারই রইল। তবে কোন রকম উৎপীড়ন-অত্যাচার যেন তার ওপর না হয়। আর সে সাবালিকা হওয়ার আগে, আসামী জেল থেকে বেরোবার আগে, মেয়ের বিয়ে আর কারো সঙ্গে জোর করে না দেওয়ার জন্যে জজ জয়ন্তীর বাবাকে অনুরোধ করেছেন।

জয়দেব আর অমলেন্দু দুজনেই ভেবেছিল, আসামীর আরও বেশি শাস্তি হবে। জয়টা যেন পুরোপুরি জয় হল না। কিন্তু

জজের এইটুকু আনুকূল্যও জয়ন্তীর প্রত্যাশার অতীত। তাই মনে মনে সে একটু খুশিই হল। বাপের কাছে ফিরে যেতে তার আর অসম্মতি দেখা গেল না। ভাবখানা এই, সে তো শুধু তার বাবা-কাকার আশ্রয়ে যাচ্ছে না, আইনের আশ্রয়ে যাচ্ছে।

ট্যাক্সি করে সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন বিমলেন্দু। জয়ন্তী কাঠ হয়ে একদিকে বসে রইল। শুধু সস্তা দামের একখানা শাড়ি আর ব্লাউজ পরনে। হাত-পা সব খালি। গায়ে গয়না যে কখানা ছিল, গোবিন্দের মামলার খরচ চালাবার জন্যে সব বিক্রী করে দিয়েছে। তার সেই কাঠিন্য দেখে বিমলেন্দুর নিজেরই সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, ও মেয়েকে আর বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে? গাড়ির দরজা খুলে পাশেই এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যান—থলি ভরে ছেলেবেলায় যেমন মাঝে মাঝে বিড়ালের বাচ্ছা পার করতেন তেমনি। নিজের বাচ্ছার ওপর সেই মুহূর্তে তার চেয়ে বেশি সহানুভূতি হয়নি বিমলেন্দুর। কিন্তু বাড়িতে এসে খানিক বাদে দুটি দৃশ্যে বিমলেন্দুর সেই নিস্পৃহ নির্মম মন ফের হু হু করে উঠল। তিনি আসামী আর ফরিয়াদী দুই পক্ষকে প্রায় একই অবস্থায় দেখতে পেলেন। জয়ন্তী তার কোণের ঘরে জানালার গরাদে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইল। আর অমলেন্দুকেও তার ঘরে চেয়ারের ওপর গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে দেখলেন। এবারও তো সে

জয়ী হয়েছে। কিন্তু সেই জয়োল্লাসের কোন বহিঃপ্রকাশ এবার আর দেখা গেল না। কর্মীদলকে উকিলকে জামাইকে খাওয়াবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল না। গতবারের মত পাঁঠা মুরগী দূরে থাকুক, রাত্রে খাওয়ার সময় একটু মাছ পর্যন্ত কারো পাতের কাছে দেখতে পেলেন না বিমলেন্দু। এই অবসাদ কিসের অমলের? পুরোপুরি জয়ী না হওয়ার জন্যে? বিমলেন্দুর তা মনে হল না। কিছুদিন বাদে জয়ন্তী মাঝে মাঝে প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়ে কয়েদীকে দেখে আসতে লাগল। রোজ নয়, প্রথম প্রথম সপ্তাহে একবার, তারপর মাসে দুবার। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। বাধা দিলেও শুনবে না। তাছাড়া এই দেখা করাটা আইনবিরুদ্ধ নয়। তবু ব্যাপারটা সবারই খারাপ লাগতে লাগল।

বিমলেন্দুর বাবা বললেন, 'চোখের ওপর এত অনাচার তো আর সয় না। অন্য কোথাও গিয়ে জোর করে ওর বিয়ে দিয়ে দে। আইন করবে কচু। বিয়ে একবার দিয়ে দিলে জজ কি তোর বাড়ি বয়ে ঠেকাতে আসবে নাকি? তার তো খেয়ে দেয়ে আর ঘুম নেই।'

বিমলেন্দু বললেন, 'দিন না আপনারা। জ্যোৎস্নার বিয়ে দিয়েছিলেন, ওরও বিয়ে দিন। আমার কিছুতে আপত্তি নেই।'

কিন্তু বিবাহ-প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ আর জয়ন্তীর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেলেন না। অমলেন্দু তার কাজকর্মে মন দিল। শহীদ-নগর উদ্বাস্তু কলোনীতে ছোট একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার

কাজে সে দলবল নিয়ে মেতে উঠল। অফিসের সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু তার ওই কাজেই কাটে। জয়ন্তী বলে কেউ যে এবাড়িতে আছে, কি কোনদিন ছিল, তা তার ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় না।

ইন্দিরা বলে, 'ওর কি? ওর একজন গেছে, দশ জন হয়েছে। শহরে ওর বোন, বান্ধবী, বউদি, ভাইঝি কিছুর কি অভাব আছে নাকি? নিনাইয়ার শতেক নাও।'

শুধু অমলেন্দুর সঙ্গেই নয়, বাড়ির আর কারো সঙ্গেই জয়ন্তীর তেমন বাক্যালাপ নেই। নিতান্ত দরকার না পড়লে জয়ন্তীও কারো সঙ্গে কথা বলে না, অন্য কেউও জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলতে যায় না। এমন কি শঙ্কু রঙ্কু পর্যন্ত ছোড়দিকে এড়িয়ে চলে। এতটা নিষ্ঠুরতা আবার বিমলেন্দুর ভালো লাগে না। হাজার হোক বাড়িরই তো মেয়ে, তাছাড়া বয়সে এখনো ছেলেমানুষ। ওকে ওভাবে কোণঠাসা করে রাখাটা কি ঠিক? বিমলেন্দু লক্ষ্য করেন, পাড়ায় ওর সঙ্গী-সাথী কেউ নেই। আগে দল বেধে স্কুলের মেয়েরা ওর কাছে আসত। কত হাসাহাসি, ছুটোছুটি হত। এখন আর কেউ আসে না। ওর বন্দীদশা দেখে বিমলেন্দুর মাঝে মাঝে ভারি কষ্ট হয়।

তিনি স্পষ্ট করে তা না বললেও, জয়ন্তী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সেকথা বুঝতে পারল। তারপর একদিন জ্যোৎস্নার ছেলের মুখে-ভাতে বাড়ির সবাই নিমন্ত্রিত হয়ে যাদবপুরে গেলেন, বাড়ি আর জয়ন্তীকে আগলাবার জন্যে রইলেন শুধু

বিমলেন্দু। তিনি এসব সামাজিক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ এড়িয়ে চলেন, সবাই সেকথা জানে। দৌহিত্রের মুখ আগেই দেখে এসেছেন, আবার কি!

সেই নির্জন বাড়ি পেয়ে জয়ন্তী তাঁর কাছে এসে খুব আস্তে ডাকল, 'বাবা!'

বিমলেন্দু চুপ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। একটু চমকে উঠলেন। বললেন, 'কি রে!'

জয়ন্তী বলল, 'তোমার আলমারি থেকে দু-একখানা বই কি নেব?'

বিমলেন্দু বললেন, 'আমার আলমারি তো তোদের কাছে ছেলেবেলা থেকেই খোলা। যখন পড়তে পারতিসনে তখনও ছবি দেখতিস। তোর মা রাগ করত। বলত, কি যে করো, দামী বইগুলি নষ্ট করে ফেলবে।'

জয়ন্তী বলল, 'নষ্ট করতাম না কি?'

বিমলেন্দু বললেন, 'না, তুই খুব দুরন্ত ছিলি, কিন্তু বইয়ের পাতা কোনদিন তোকে ছিঁড়তে দেখিনি।'

একথার পর জয়ন্তী চুপ করে রইল। তারপরে খানকয়েক আধুনিক বাংলা উপন্যাস বেছে বার করে নিল। এরপর মাঝে মাঝে সে প্রায়ই আসতে লাগল। তবে খোলাখুলি ভাবে নয়। একটু আড়াল আবডাল খুঁজে। বিমলেন্দু মনে মনে হাসলেন। বাপ-মেয়ের ভালবাসা—অবস্থা বিশেষে তাতেও কখনও কখনও লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয়।

কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রইল না। ইন্দিরা একদিন বলল, 'তুমি বুঝি আবার ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছ?'

বিমলেন্দু বললেন, 'প্রশ্রয় তুমিও কম দিচ্ছ না। এই তো কালও ওর চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছিলে।'

ইন্দিরা হেসে বলল, 'তোমার চোখে দেখি সবই পড়ে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তোমার চোখের সঙ্গে মিল আছে।'

দিনকয়েক বাদে তিনি জয়ন্তীকে অন্য একটা ইস্কুল-টিস্কুল দেখে ভর্তি হতে বললেন। কিন্তু সে রাজী হল না। বলল, 'দরকার নেই। সার্টিফিকেট নিতে আবার হাঙ্গামায় পড়তে হবে।'

ইন্দিরা বলল, 'তাহলে প্রাইভেটে পড়।'

জয়ন্তী বলল, 'না।'

বিমলেন্দু বললেন, 'রঙ্কু-শঙ্কুর জন্যে মাস্টারমশাই তো আসছেনই। তুই তাঁর কাছে পড় না।'

জয়ন্তী হঠাৎ বলল, 'মাইনে?'

বিমলেন্দু ওর এই চুলচেরা হিসেবে এবার হেসে ফেললেন। বললেন, 'তাই তো, তা এক কাজ কর। এখন টাকাটা ধার হিসেবেই নে। পরে শোধ দিয়ে দিস। বই যেমন ধার নিয়ে পড়ছিস, তোর ভাইদের-প্রাইভেট টিউটরের কাছ থেকে বিদ্যে-টাও ধার নিয়ে রাখ। পরে হয়তো বেশি দরে বিক্রী হবে। সুভদ্রাই হোস, আর চিত্রাঙ্গদাই হোস, বিদ্যেটা ফেলা যাবে না।'

কোর্টের সেই জবানবন্দীর উল্লেখে জয়ন্তী এবার মৃদু হেসে মুখ নিচু করল। একটু বাদে বলল, 'না বাবা, আমি পারব না। আমার বড্ড লজ্জা করবে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'বুড়ো মানুষের কাছে আবার কি লজ্জা।'

জয়ন্তী বলল, 'না, আমার সবাএর কাছেই লজ্জা করে।'

নির্লজ্জা পাষাণী মেয়ের এ কি উল্টো স্বীকারোক্তি। বিমলেন্দু বিস্মিত হয়ে ভাবলেন। তারপর হঠাৎ বলে ফেললেন, 'আমি তোর লজ্জার কারণটা জানি জয়ন্তী। তোর লজ্জার মূলে ওই বে-আইনী সিঁদুর।'

সঙ্গে সঙ্গে সিঁদুরের মতই মুখখানা লাল টুকটুকে হয়ে উঠল জয়ন্তীর। এতকাল বাদে হঠাৎ যেন নিজের সিঁথির সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি দুই হাতের তালুতে মুখ লুকাল জয়ন্তী। বিমলেন্দুর মনে পড়ল—ছ-সাত বছর বয়সে যখন খেলাঘরে বিয়ে-বিয়ে খেলত, তখনও একদিন ধরা পড়ে এমনি করে মুখ লুকিয়েছিল তাঁর মেয়ে। ছি ছি, ওর এই সিঁথির সিঁদুর তার পক্ষে শোভন হয়নি।

সেদিন থেকে সিঁদুরের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিল জয়ন্তী। সিঁথিতে একটু ছোঁয়ায় কি ছোঁয়ায় না। শুধু মাসে দু-একবার যেদিন গোবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে যায়, সেদিন একটু মোটা রেখার সিঁদুর দেয় সিঁথিতে। বিমলেন্দু তাঁর স্ত্রীর কাছে শুনেছেন—সিঁদুরের দাগ অস্পষ্ট দেখলে গোবিন্দ নাকি ভারি রাগ করে। রাগের চেয়ে দুঃখ করে বেশি।

এখনও ওদের দেখা-সাক্ষাৎ চলে, একথা শুনে জয়দেব তাঁকে বলেছিল, 'ওসব আবার করতে দিচ্ছ কেন, একটু শক্ত হলেই পারতে।'

কিন্তু কী করে আর শক্ত হবেন তাঁরা ? শক্ত হয়ে লাভই বা আর কি ? ওর এ বিষয়ে স্টেটমেণ্ট সবই আদালতের নথি-পত্রে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। রায়ের নকল ওর কাছেও আছে।

মাস্টারমশাইর কাছে না পড়লেও নিজে নিজে পড়াশুনোটা চালিয়ে গেল জয়ন্তী। আর আশ্চর্য, স্কুল-ফাইনাল ফার্স্ট ডিভিসনেই পাশ করল। সবাই আশান্বিত হলেন। হয়তো এবার ওর মত বদলাতেও পারে, নিজের ভুল নিজে শোধরাতেও পারে।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। গোবিন্দ ছাড়া পাওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ওরা ম্যারেজ-রেজিস্টারের অফিসে গিয়ে ওদের বিয়েটা পাশ করে নিল।

আর একবার আপত্তি অভিযোগ আর অসন্তুষ্টির ঢেউ উঠল পরিবারে। নতুন করে আর একবার সবাই তীব্র আঘাত পেলেন। বিমলেন্দুর এই মেয়ের বিয়েতে কাউকেই কিছু করতে হল না। আলো জ্বলল না, ছাদের ওপর মেরাপ বাঁধা হল না, নিমন্ত্রণের পাতা পড়ল না। কিছুই হল না। ইন্দিরা আর একবার লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদল। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে গেল না।

বিমলেন্দু শুনতে পেলেন—সদানন্দ রোডে একতলায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে ওরা আছে। লাইসেন্স্ করিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভারই হয়েছে গোবিন্দ। টাকা-পয়সা নিতান্ত মন্দ পায় না; দুজনের খেয়ে-খরচে ভালই চলে যায়। তবু ড্রাইভার তো ড্রাইভারই। আজকাল অবশ্য অনেক ভদ্রলোকের ছেলেও ড্রাইভিং করে। কিন্তু গোবিন্দকে দেখলেই জাত-ড্রাইভার বলে মনে হয়। যেমন গোঁয়ার তেমনি চোয়াড়ে চেহারা।

শঙ্কু-রঙ্কু নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে গোপনে ছোড়দিকে গিয়ে দেখে আসে। এই যাওয়াটাকে ছোড়দির মতই হয়তো বড় একটা এ্যাডভেঞ্চার বলে মনে করে ওরা। ইন্দিরা ওদের কাছ থেকে জয়ন্তীর খবর পায়। মাঝে মাঝে ওদের নাকি খুব রাগা-রাগি, ঝগড়াঝাটি লাগে। পশুরাজ যদি রাগে, তাহলে নাকি এক প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়। কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র ছিঁড়ে ছড়িয়ে সব নষ্ট করে দেয় গোবিন্দ। এক দুর্দান্ত দানব। তার যেমন কাম তেমনি ক্রোধ।

ইন্দিরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, ‘মেয়েটাকে একদিন মেরেই ফেলবে। তাছাড়া আমরা ওকে জেল খাটিয়েছি, সে আক্রোশ তো ওর আছেই।’

খবর দিতে দিতে শেষে একদিন জয়ন্তী এল তার বাপ-মার সঙ্গে দেখা করতে। ইন্দিরা খুঁটে খুঁটে সব জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু জয়ন্তীকে যে তার স্বামী মারধর করে, কি কোন রকম

জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, সে কথা সে কিছুতেই স্বীকার করল না। বরং শাড়ি-গয়না দেখিয়ে উল্টোটাই বুঝাবার চেষ্টা করল। হেসে বলল, 'শঙ্কু-রঙ্কু অমন স্পাই হয়েছে নাকি মা? তাহলে তো ওদের আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া যায় না। যাওয়ার আগে বিমলেন্দুকেও প্রণাম করে গেল জয়ন্তী। আগন্তুকদের জন্যে রাখা চেয়ারটায় বড় মেয়ে জ্যোৎস্নাকে যেমন একদিন বসতে বলেছিলেন, ছোট মেয়েকেও তেমনি সেই সম্মানের আসন দিলেন। বাপের কাছে পূর্ণবয়স্কা নারীর মর্যাদা পেল জয়ন্তী। তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বিমলেন্দুর মনে হল, তাঁর এইটুকু মেয়ে কত বড় লজ্জা পার হয়ে এসেছে সংসারে, কত অনলে পুড়েছে, কত গরলকে জীর্ণ করেছে। ওর মুখ দেখে তাঁর পিতৃহৃদয় বুঝতে পারল—ও পুরোপুরি সুখে নেই। পুরো সুখ সংসারে কারই বা হয়?

বিমলেন্দু বললেন, 'আমাকে একটা কথা সত্যি বলবি জয়ন্তী?'

জয়ন্তী শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা বাবা?'

বিমলেন্দু বললেন, 'ও জেল খেটেছে বলে কি তোর ওপর —মানে সেইজন্যে কি কোন আক্রোশ—'

জয়ন্তী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না-না, সেসব কিছু নয়।'

বিমলেন্দু বললেন, 'তবে?'

জয়ন্তী যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, 'তবে ঠিক আগের মতও আর নেই। অনেক বদলে গেছে। জেল বোধ হয় মানুষকে

বদলেই দেয়।'

'কি রকম?'

জয়ন্তী বলল, 'আমাদের সভ্যতা শিক্ষা সংস্কৃতি সব ব্যাপারের ওপর ও যেন হাড়ে হাড়ে চটা। এত রাগ ওর আগে ছিল না, এত সংকীর্ণতাও ওর আগে ছিল না। আমি বলি, একটা ঘটে গেছে বলে তুমি অমন হবে কেন? সভ্যতার সবই কি খারাপ? ভদ্রলোকদের সবই কি খারাপ? কিন্তু সে ওসব কথা মোটেই সহ্য করতে পারে না। এই নিয়েই লাগে।'

বিমলেন্দু ভাবলেন, লোকটা কি তাহলে সত্যিই জন্তু হয়ে গেছে? ফের ফিকির খুঁজছে বনে-জঙ্গলে ঢুকবার?

জয়ন্তী যেন নিজের মনেই বলে ফেললে, 'তাছাড়া জেল থেকে কতকগুলি খারাপ অভ্যাসও সে নিয়ে বেরিয়েছে। কিছুতেই সেগুলি ছাড়াতে পারছে না। তাই নিয়ে রোজ—'

বিমলেন্দু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খারাপ অভ্যাস মানে?'

জয়ন্তী লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করল। কথাটা বাবার কানে দেওয়ার ইচ্ছা যেন ওর ছিল না। হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। ও এবার প্রাণপণে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা করে বলল, 'ও কিছু নয় বাবা। আমি একটা জিনিস চাইছিলাম। দেবে?'

বিমলেন্দু হাসলেন, 'খুব যে ফর্মালিটি শিখেছিস। পিতৃ-স্নেহ যদি চাও দিতে পারব না, কারণ পিতৃভক্তি পাইনি।'

মনে হল, নিজের বাবার কথাগুলিরই যেন পুনরাবৃত্তি

করলেন বিমলেন্দু। অবশ্য একটু পরিহাসের সুর লাগিয়ে।

তাঁর কথার ভঙ্গিতে জয়ন্তীও হাসল, বলল, 'না। অতবড় আদান-প্রদানের কথা বলছি না। আমাদের এই ঘরে ওই যে গ্রুপ ফটোখানা আছে, তার এক কপি তো দিদি পেয়েছে, আমি একটা পাব না?'

মেয়ের কথা শুনে হঠাৎ বাৎসল্যে উদ্বেল হয়ে উঠলেন বিমলেন্দু। আবেগটা একটু সংবরণ করে নিয়ে বললেন, 'পাবিনে কেন? ওইটাই নিয়ে যা। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে পেড়ে নিয়ে যা। তুই বোধ হয় অমনিতেই নাগাল পাবি।'

নিজের দৈর্ঘ্যের কথা ভেবে জয়ন্তীও হাসল, বলল, 'তা পাব। কিন্তু ওটা নেব না বাবা। ওই একটা মাত্র কপিই এ বাড়িতে আছে। তুমি আর একটা কপি করিয়ে দিও। আজ যাই।'

মেয়ের এই আবদার রাখবার ভার নিজেই নিলেন বিমলেন্দু। আর কাউকে বরাত দিলেন না। দিন দুই বাদে অফিস যাওয়ার পথে ফটোখানা খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। ভালো একটা ষ্টুডিওতে দিয়ে যাবেন। একটা কপি তারা নিশ্চয়ই করে দিতে পারবে। কত চার্জ করবে কে জানে? যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল জয়দেবের কথা। ভাবলেন—জয়ন্তীর ব্যাপারটা ওকে জানিয়ে যাবেন। তার দুর্ভোগের মূলে যে জয়দেবরাই এই অনুযোগটুকু দেওয়ার লোভ বিমলেন্দু সামলাতে পারলেন না। ট্রাম থেকে নেমে মনোহরপুকুর রোড ধরে খানিকটা

এগিয়ে উকিল বন্ধুর বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলেন। তখন বাইরের জন তুই মক্কেলের সঙ্গে জয়দেব গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁকে দেখে জয়দেব খুব প্রসন্ন হল না, সংক্ষেপে বলল, 'এসো। আবার কি ব্যাপার?'

বিমলেন্দু বললেন, 'না না, কিছু ব্যাপার নয়, এমনিই এলাম।'

'বেশ তো বসো।'

মক্কেলদের সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ বেশ জোরালো কথাবার্তা হল। বিমলেন্দু আন্দাজ করলেন—টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে কী যেন গোলমাল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওদের তুজনকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। সেখানে কথাবার্তা সেরে ওদের বিদায় দিয়ে ফিরে এসে নিজের বড় চেয়ারটিতে বসে মুখে হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? জয়ন্তীর খবর কি?'

বিমলেন্দু বললেন, 'তার খবর দিতেই এলাম।'

গোবিন্দের স্বভাব-প্রকৃতির পরিবর্তনের কথা, স্বামীর সঙ্গে জয়ন্তীর ইদানীংকার সম্বন্ধের ধরণটা বন্ধুকে মোটামুটি জানিয়ে বিমলেন্দু হঠাৎ মন্তব্য করে বসলেন, 'দেখ, আমার মনে হয় তোমরাই এর জন্যে দায়ী। তোমরা যদি কেসটা চালাবার জন্যে অমন উঠে পড়ে না লাগতে—'

জয়দেব হঠাৎ চটে উঠে বলল, 'বটে, এখন এতদিন বাদে তুমি এই কথা বলছ! আমরা যদি তখন কেস না করতাম, যদি ও বিনা পানিসমেণ্টে ছাড়া পেয়ে যেত, তাহলে ওই

স্কাউণ্ড্রেলটা তোমার মেয়েকে এমন ভদ্রভাবে বিয়ে করত বলে ভেবেছ নাকি ? দুদিন ছিনিমিনি খেলে তিনদিনের দিন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিত। আর একজনের খেলার পুতুল হত তোমার মেয়ে। ওসব লোককে আমার যথেষ্ট চেনা আছে। Culprit তো জীবনে কম দেখলাম না। জেল হয়েছে বলে তবু খানিকটা শিক্ষা হয়েছে।'

বিমলেন্দু একটু হেসে বললেন, 'শিক্ষার নমুনাটা তো শুনলে।'

জয়দেব বলল, 'হ্যাঁ শুনলাম। কিন্তু সবাইয়ের অমন হয় না। জেল থেকে কেউ কেউ নানারকম perversion নিয়ে বেরোয় বটে, কিন্তু সে সব perversion কি জেলের বাইরেও আমরা দেখিনে ? শুধু জেলকে দোষ দিয়ে লাভ কি ? আমি বলছিনে জেলের ব্যবস্থা নির্দোষ, দোষ-ত্রুটি যথেষ্টই আছে, আস্তে আস্তে তা শোধরানোও হচ্ছে, কিন্তু তুমি যদি বলতে চাও, আইন-আদালত জেল-ফাঁসি সব তুলে দেওয়ার সময় এসেছে, তাহলে আমি বলব, তুমি একটি গ্রেট ফুল। জেলের দরজা একদিনের জন্য তুমি খুলে দাও দেখি, এক রাত্রের মধ্যে দুনিয়ার সভ্যতাকে ওরা রসাতলে পাঠাবে।'

বিমলেন্দু মৃদু আপত্তির সুরে বললেন, 'আহা, অত চটছ কেন, আমি কি তাই বলেছি।'

জয়দেব বলল, 'তুমি কবে তোমার মনের কথা খুলে বল ? তোমার তো চিরকালের ওই এক অভ্যাস। তোমার কথার

আধখানা বোঝা যায়, আর আধখানা বোঝা যায় না। তবু তোমাকে আমি দোষ দিইনে, তুমি মানুষ হিসেবে খারাপও না। তোমার হৃদয় বলে বস্তু আছে।'

কিন্তু বিমলেন্দুই যে আগাগোড়া হৃদয় দিয়ে মোড়া, সে কথা কি তিনি বলতে পারেন? না সে কথা তিনি নিজেও বলেন না? তাছাড়া অনেক সময় যুক্তিহীন ভাবালুতাও যে হৃদয়তার নামে চলে যায় তা তিনি জানেন।

আরে তোমার অফিস-টফিস নেই? তুমি এখনও এখানে বসে আছ নাকি?'

মুখে পাইপ, বাঁ-হাতে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ, ডান হাতে নতুন ঝকঝকে টাইটা ঠিক করতে করতে জয়দেব ভিতর থেকে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। পরিপাটি বেশ, নিখুঁত করে কামানো মুখ, ব্যাকব্রাস করা কালো মসৃণ চুল, ভিতরে দু-চার গাছা হয়তো পেকেছে, কিন্তু এখন আর তা ধরা যায় না। পায়ে দামী গ্লেসকিড ঝকঝক করছে।

বন্ধুর দিকে আরও দু-এক পা এগিয়ে জয়দেব বলল, 'তুমি যদি দেরিই করলে, ভিতরে গেলে না কেন? দেখ তো কাণ্ড।'

বিমলেন্দু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমার ভাই আর খেয়াল ছিল না।'

জয়দেব হেসে বললে, 'ও, তোমার তো আবার আর

এক রোগ আছে। মাঝে মাঝে তুমি সেই রামপ্রসাদের মত 'ডুব দে রে মন কালী বলে'—তা একঘণ্টা দশ মিনিট তুমি ডুব সাঁতার কেটেছ বিমল। সোজা কথা নয়।'

হাতঘড়ি মিলিয়ে দেখল জয়দেব।

বিমলেন্দু বললেন, 'মাত্র একঘণ্টা দশ মিনিট? আমি যে এব জীবনের স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে উঠলাম।'

জয়দেব বলল, 'ও ব্যাপারে তোমার জুড়ি নেই। চল, এবার উঠে পড়। বেলা হয়ে গেল।'

বিশ্বস্ত চাকর ভজনকে সদর দরজা দেখতে বলে বন্ধুকে নিয়ে জয়দেব বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। অনেক দূরে একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে চীৎকার করে তাকে কাছে ডাকল। তারপর বন্ধুকে নিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। ড্রাইভারকে বলল, 'পুলিশ কোর্ট।' তারপর বন্ধুকে বলল, 'চল আমার সঙ্গে। তোমাকে ধর্মতলার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে যাব।' গাড়ি চলতে লাগল।

একটু বাদে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে জয়দেব হেসে বলল, 'তুমি রাগ করনি তো? একটু আগে তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছি। মাথাটা বড্ড গরম ছিল। তাই মুখখানা একটি ভলক্যানোর মাউথ হয়ে উঠেছিল। আমার মক্কেল পুঙ্গবের ধারণা আমি তার শ'দেড়েক টাকা মেরে দিয়েছি। কথার ভাবভঙ্গি দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তাই তোমাকে—কিছু মনে কোর না।'

বিমলেন্দু একটু হেসে বললেন, 'মনে আবার কি করব।'

জয়দেব বলতে লাগল, 'দেখা যাক। জয়ন্তীর যদি আরও ট্রাবল হয়, আমরা লোকটাকে সহজে ছেড়ে দেব না। ফের কোর্টে টেনে নিয়ে যাব। তারপর একটু চেষ্টা-চরিত্র করে সাক্ষী, টাক্ষি সব ঠিক করে নিয়ে, দরকার হলে ডিভোর্সের মামলা আনাও কঠিন হবে না, প্রভিসন তো আছেই—'

জয়দেব হাসল একটু।

বিমলেন্দু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না না, আমি তা বলিনি জয়দেব—'

জয়দেব হেসে বলল. 'তোমার তো সব ব্যাপারেই ভয়। যাকগে, সে যখন হবার হবে তখন হবে। তুমি হাতে করে ওটা কি নিয়ে যাচ্ছ? কাগজে মোড়া ও জিনিসটা কি?'

বিমলেন্দু একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'এটা ভাই আমাদের বাড়ির সেই গ্রুপ ফটো। অনেক দিনের পুরনো।

জয়দেব বলল, 'দেখি দেখি। আহা খোলই না। খুললে কি আর ফের বাঁধা যায় না? আমারও একটা গ্রুপ করাতে হবে।'

বিমলেন্দু মোটা সুতোর বাঁধনটা খুলে ফেললেন। বড় ফটো নয়। মাত্র হাফ্ সাইজ।

কাগজের ঢাকাটা সরিয়ে ফেলে জয়দেব একবার ফটো-খানার ওপরে চোখ বুলিয়ে বলল, 'ওঃ, এ তো দেখেছি। এ তোমার অনেক দিন আগের তোলা। Recently কিছু তোলনি তাহলে?

বিমলেন্দু বললেন, 'না।'

জয়দেবের হঠাৎ সাহাদের চিটিং কেসটির একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল। সে ব্যাগ খুলে নথি দেখতে লাগল।

কাগজ দিয়ে বাঁধানো ফটোটা মুড়ে ফেলবার আগে আর একবার সেদিকে তাকালেন বিমলেন্দু। অনেক দিন আগের তোলা গ্রুপ। জয়ন্তীর তখন বয়েস কত—আড়াই বছরের বেশী নয়। শঙ্কু-শঙ্কু তখনও হয়নি। কিন্তু ওরা ছাড়া এ গ্রুপে আর সবাই আছে। বিমলেন্দু দেখতে লাগলেন। সামনে পাশাপাশি দুখানা চেয়ার পেতে বসা তাঁর বাবা-মা। ওঁদের স্বাস্থ্য তখন বেশ ভালো ছিল। পিছনের সারিতে দাঁড়ানো বিমলেন্দু-ইন্দিরা, আর একপাশে অমলেন্দু দুই ভাইঝিকে উঁচু করে ধরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। বিমলেন্দু সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল—জয়ন্তী কি এইজন্যেই তাঁদের এই বিশেষ গ্রুপ ফটোখানা নিতে চেয়েছে? পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেও তার স্মৃতির মালা গাঁথতে সুরু করেছে মনে মনে? ঠিক যেমন বিমলেন্দু করেন! ছেঁড়েন আর জোড়েন—ছেঁড়েন আর জোড়েন! জীবন মানেই তো তাই।

সমাপ্ত

এই লেখকের

মিশ্ররাগ
শ্রেষ্ঠগল্প
চেনামহল
দূরভাষিণী
কন্যাকুমারী
চড়াই উৎরাই
হলদে বাড়ী
দীপপুঞ্জ
অসবর্ণা
ওপাশের দরজা
মলাটের রঙ
অসমতল
পতাকা
অক্ষরে অক্ষরে
দেহমন

উত্তরণ
সহৃদয়া
রূপালি রেখা
দীপান্বিতা
একূল-ওকূল
অক্ষরে অক্ষরে
সঙ্গিনী
গোধূলি
কাঠ-গোলাপ

অনুরাগিণী
শুক্লপক্ষ
বসন্ত পঞ্চম
নিরিবিলি